বাংলার নবজাগরণে

ডিরোজিও

(জীবন ও সাহিত্য)



বর্ণালী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ১৯৮৫
প্রকাশক ঃ শ্রীকান্তি রঞ্জন ঘোষ
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ঃ শ্রীপঞ্চানন মালাকর

মুদ্রাকর—
শ্রীবাদল চন্দ্র পাল
এস. এম. প্রিন্টিং
১৯/ডি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৬

উৎসর্গ

আমার বাবা, যাঁকে আমি
সুগভীর সততা ও নিষ্ঠার সাথে
শিক্ষকতা করতে দেখেছি,
তাঁরই উদ্দেশে —

মুখবন্ধ

সত্যের প্রতি আকুতি যে সংশয়ের ধাত্রীভূমি, সেই সংশয় বরণীয়। যে প্রশ্ন আপ্তবাক্যের অসহ্য দাপট থেকে মুক্তির কামনায় জন্ম নেয়, সেই প্রশ্ন মহান। অথচ প্রতিটি যুগেই দেখা গেছে, যাঁরা এই সংশয় উত্থাপন করেছেন, প্রশ্ন তুলেছেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা কখনওই ভালো চোখে দেখেনি তাঁদের। তাঁদের উপর নেমে এসেছে সীমাহীন সামাজিক অত্যাচার। তাঁরা দণ্ডিত হয়েছেন প্রতিক্রিয়ার অন্ধ শক্তির বিচারে। অথচ তাঁরাই ছিলেন মানবের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এই বাংলার বুকে আজ থেকে ১৭০ বছরেরও বেশি সময় আগে হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর ভাগ্যও ওইসব দণ্ডিত মানুষগুলির চেয়ে ব্যতিক্রমী কিছু ছিল না। কারণ সত্যের প্রতি সুগভীর আকুতি নিয়ে তিনিও একদিন প্রচলিত সমাজের সমস্তরকম অন্ধ সংস্কার ও মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রায় একাকী রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। নবযুগের যুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন তাঁর ছাত্রদের। তিনি ছিলেন উনিশ শতকীয় বাংলার নবজাগরণের সেই আদর্শ শিক্ষক যাঁকে কেন্দ্র করে একদল সত্যসন্ধানী তরুণ ছাত্রের চোখ ঝলসানো সমাবেশ সেদিন ঝড় তুলেছিল গোটা সমাজে। তিনি ছিলেন আমাদের জাতীয় জীবনের প্রথম স্বদেশপ্রেমিক কবিও।

এই গ্রন্থ ডিরোজিওর জীবন ও সাহিত্য নিয়েই। যুক্তিহীন বিরাগ কিংবা অন্ধ প্রশংসা কোনটাই ডিরোজিওর প্রাপ্য নয়। ফলে এই গ্রন্থে ডিরোজিওর একটি সামগ্রিক ও যথাযথ মূল্যায়নই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিচারের ভার অবশ্যই পাঠকের। এ যুগের তরুণ বন্ধুদের মধ্যে যদি অন্ততঃ একজনেরও মনে এই গ্রন্থ ডিরোজিওর জীবন ও সংগ্রামের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ডিরোজিওর মূল্যায়নের প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গীগত ক্ষেত্রে আমাকে যিনি বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন তিনি 'পথিকৃৎ' পত্রিকার অন্যতম সংগঠক, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, শ্রী বিপ্লব চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি তাঁর অমূল্য সময় ও শ্রম ব্যয় করে আমার মূল পাণ্ডুলিপিতেও বহু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ও পরিমার্জন করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এছাড়া লাইব্রেরী থেকে ডিরোজিও সম্পর্কিত বিভিন্ন বই-পত্র সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার স্নেহের ছোট বোন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের গবেষিকা, সরিফা খাতুন (পাপিয়া)। প্রচ্ছদ তৈরি করে দিয়েছেন ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ উত্তীর্ণ ছাত্র, অনুজপ্রতিম শ্রী সুশোভন মণ্ডল। হরফ যোজনা করেছেন বন্ধুবর শ্রী অসিত বিশ্বাস। এবং আগ্রহের সাথে গ্রন্থটি প্রকাশের ভার নিয়েছেন 'আনন্দ প্রকাশন'-এর কর্ণধার শ্রীমতী কৃষ্ণা মণ্ডল। এঁদের কাছেও আমি বিশেষভাবে ঋণী।

সূচীপত্র

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

১৫৫, লোয়ার সার্কুলার রোড। বর্তমানে, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড। মৌলালির মোড় থেকে দক্ষিণমুখো সামান্য কয়েক পা হেঁটে গেলেই বিরাট এই সেকেলে বাড়িটা। আজ কিন্তু তার স্তম্ভ কিংবা দেওয়ালে কান পাতলেও ইতিহাসের কোন কথাই শুনতে পাওয়া যাবে না। বিশ্বায়নের মন্ত্র-জপা বর্তমানের কড়া ধমকে ইতিহাস এখান থেকে বিদায় নিয়েছে। অথচ এই বাড়িতেই, আজ থেকে দুশো বছর আগে, ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেছিলেন নবযুগের বাংলার সেই অবিস্মরণীয় শিক্ষক ও কবি, হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, যিনি যথাসাধ্য চেষ্টায় একদল তরুণ ছাত্রকে সত্য, স্বাধীনতা ও যুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করে উনিশ শতকের সেই তমসাচ্ছন্ন দ্বিতীয় প্রহরে ঝড় তুলেছিলেন সমাজে এবং যাঁর কাব্যেই এদেশে প্রথম ফুটে উঠেছিল স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও দাসত্বমুক্তির আকুতি। মাত্র বাইশ বছর ডিরোজিও এই পৃথিবীতে বেঁচেছিলেন। স্বল্পস্থায়ী এই জীবনকালের মধ্যে বছরখানেক বিহারের ভাগলপুর ছাড়া তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলি কেটে গিয়েছিল লোয়ার সার্কুলার রোডের এই বাড়িটাতেই। এই বাড়িতেই নিয়মিত বসত তাঁর ছাত্রদের সভা-বৈঠক এবং এই বাড়িতেই ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর মৃত্যু হয় তাঁর। অথচ, আজ ভাবতে কষ্ট হয়, তাঁর স্মৃতির কিছুমাত্র অবশিষ্টও সেখানে নেই। বহুকাল আগেই মালিকানা বদল হয়ে হাতছাড়া হয়ে গেছে বাড়িটা। আজ তার ভেতরে ঢুকেই

বিসদৃশভাবে চোখে পড়ে একটা শিবমন্দির। তারপর পুরো বাড়িটা জুড়েই প্রাইভেট ক্লিনিক, বেসরকারি নার্সিং হোম। গেটের ওপর ওই ক্লিনিকেরই নাম লেখা বিশাল হোর্ডিং। শুধু রাস্তার পাশে এক কোণে অনাদরে, অবহেলায় ঝুলছে একটি ধুলোমলিন চোখে পড়ে না এমন প্রস্তরফলক, যাতে লেখা—

"এই স্থানে অবস্থান করতেন উনি শতকের মহত্তম শিক্ষক, যুক্তিবাদের পথিকৃৎ, সতীদাহ ক্রীতদাসত্ববিরোধী প্রবল যোদ্ধা হেনরী লুই ডিরোজিও। তাঁর ১৫০তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে এই স্মৃতিফলক স্থাপিত হ'ল।"

প্রায় বছর পঞ্চাশেক আগে ডিরোজিওর জীবনচরিতকার, বিনয় ঘোষ লিখেছিলেন, "বাড়িটি বাংলার তরুণদের পীঠস্থান হবার যোগ্য।" অথচ কালের কী নির্মম পরিহাস, আজ সামান্য কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে গেলেও ইতিহাসসন্ধানী একালের কোন পথিক এ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দস্তুরমতো হতাশই হবেন। আমাদের নৃশংস বিস্মৃতিপরায়ণতা তাঁর ক্ষুব্ধ, বিস্মিত মনকে হয়ত একটা ঝাঁকুনি দেবে শুধু।

মাত্র বাইশ বছরের জীবনে যে অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর ডিরোজিও তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে এবং সর্বোপরি, নব্যবঙ্গের একজন আদর্শ শিক্ষাগুরু হিসাবে রেখেছিলেন, তা আজও আমাদের বিস্মিত করে। এদেশের নবজাগরণের ইতিহাসে ডিরোজিও যেন একটা বিস্ময়। উনিশ শতকীয় বাংলার তমসাচ্ছন্ন সমাজ-পরিবেশে ধূমকেতুর মত তাঁর আবির্ভাব। এই আবির্ভাব প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল এদেশের জরাগ্রস্ত, সুপ্ত সমাজকে। তাঁর মৃত্যুর পরও বহুদিন সেই আন্দোলনের অভিঘাত বাংলার সমাজমননে অলক্ষ্যে ক্রিয়া করে গেছে। একথা ঠিক, রামমোহনের যুগান্তকারী সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই উনিশ শতকের সেই সূচনালগ্নে এদেশের স্থবির সামাজিক আয়তনে প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়া, প্রাচীনপন্থী ও প্রগতিপন্থীদের তুমুল দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। ডিরোজিও সেই দ্বন্দ্বকে আরও ত্বরান্বিত করেছিলেন, তীব্রতর করেছিলেন। প্রগতির পক্ষকে শক্তিশালী করেছিলেন। নবযুগের জীবনদর্শন নিজের জীবন ও সমাজে প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি অশেষভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন সমাজের গোঁড়া প্রাচীনপন্থীদের হাতে, এবং সেই অনাত্মীয় সমাজের উপর্যুপরি নির্মমতায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে একদিন আকস্মিকভাবেই যবনিকা নেমে আসে তাঁর

জীবননাট্যে। একটি অমিত সম্ভাবনাময় মহৎ জীবনের এই ট্র্যাজিক পরিণতি তাঁর জীবনকে আমাদের কাছে আরও রোমাঞ্চকর, আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তাঁর কাছে ঋণ আমাদের অনেক। একথা আজ আমরা কজনই বা স্মরণ করি, আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাথে এদেশীয় নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে যোগাযোগ উনিশ শতকের একটি প্রধানতম ঘটনা, সেই যোগাযোগের প্রথম সার্থক সূত্রটি ডিরোজিওই ছিলেন!

এন্টালি অঞ্চলে লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে ডিরোজিও যেদিন জন্মগ্রহণ করেন, তখনও রামমোহন পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসেন নি। ডিরোজিওর বয়স যখন মাত্র ছয় অর্থাৎ যখন তাঁকে শিক্ষালাভের জন্য প্রথম পাঠানো হচ্ছে ধর্মতলায় ড্রামন্ড সাহেবের স্কুলে, তখন অর্থাৎ ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে স্থাপন করেন আত্মীয়সভা। বস্তুত, কলকাতায় রামমোহনের বিরাট কর্মময় জীবনের পরিধির মধ্যেই ডিরোজিওর স্বল্পস্থায়ী জীবনের সূত্রপাত এবং পরিসমাপ্তি। দিনের আলোয় রাতের তারা লুকিয়ে থাকে ঠিকই তবু রামমোহনের সেই প্রচণ্ড দীপ্তির পরিমণ্ডলেও ডিরোজিও যেন সর্বদাই একটি উজ্জ্বল দৃশ্যমান নক্ষত্র হয়ে থেকেছেন। রামমোহনকে এদেশে নবজাগরণের পথিকৃৎরূপে স্বীকার করে নিয়েও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, মানবতাবাদী আন্দোলনের সেই আদিযুগে যুক্তিবাদ, মানবাধিকার, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত এমন কিছু ধারণা ডিরোজিও তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছিলেন যা তদানীন্তন সমাজ পরিমণ্ডলে ছিল বাস্তবিকই অভিনব। তার জোরালো আঘাত সহ্য করার মত ক্ষমতা সেই পচা-গলা পুরনো সামন্তী সমাজের ছিল না। বিপিনবিহারী গুপ্তর 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে ডিরোজিও সম্পর্কে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন— "ডিরোজিও ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবানকে সরাইয়া দিয়া Reason-এর পূজা করিতেন"। বাস্তবিক, এই 'Reason'-এর কথা ডিরোজিওর মত আর কেউ সেসময় এত জোরালো, এত তীব্রভাবে ব্যক্ত করেননি। কারণ 'রিজন'ই ছিল ডিরোজিওর কাছে 'ট্রুথ' বা সত্যে উপনীত হবার একমাত্র পথ। নবযুগের

আদর্শ এই 'ট্রুথ' ও 'রিজন'-এর বাণী ডিরোজিও তাঁর তরুণ শিষ্যদের মধ্যেও সঞ্চারিত করেছিলেন। তাঁর এই তরুণ শিষ্যেরা ছিলেন হিন্দ কলেজের ছাত্র। ডিরোজিও ছিলেন তাঁদের ইতিহাস ও সাহিত্যের শিক্ষক। এঁদের কেউ বলত 'ইয়ং বেঙ্গল', কেউ বলত 'ইয়ং ক্যালকাটা', কেউ বা 'ডিরোজিয়ান'। ডিরোজিও এঁদের প্রায় সমবয়সী ছিলেন। খুব বেশি হলে দু'চার বছরের বড়। ডিরোজিওর ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের চৌম্বক আকর্ষণে এঁরা অতি অল্পদিনের মধ্যেই পরিণত হয়েছিলেন একটি ঘন সন্নিবিষ্ট দলে। হিন্দু সমাজের সমস্ত রকম অন্ধতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এঁদের সার্বিক বিদ্রোহ সেদিন তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সমাজে। হয়ত তাঁদের সেই বিদ্রোহে আতিশয্য কিছুটা ছিল, সামগ্রিকভাবে বৃহত্তর সমাজে তা গ্রহণযোগ্য হয়নি, একথা ঠিক। কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন একেক জন খাঁটি মানুষ। সত্যের চেয়ে প্রিয় আর কিছুই তাঁদের কাছে ছিল না। কলেজের সিলেবাসের সংকীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে তাঁদের শিক্ষক, তাঁদের নেতা, তাঁদের অকৃত্রিম বন্ধু ডিরোজিও এই শিক্ষাই তাঁদের দিয়েছিলেন। আর যেটা সবচেয়ে বেশি শিখিয়েছিলেন তা হল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিমিশ্র ঘৃণা।

সত্যের প্রতি গভীর আকুতি নিয়ে ডিরোজিও একদিন লিখেছিলেন—

O Truth!
Thou whom my soul hath sought
like a rich jewel,
For which the adventurer
will risk his all —
How hast thou taught me
that my aspirations
Wore not a tint of earth!

একজন শিক্ষকের জীবন থেকে উঠে আসা এই কবিতা সেদিন স্পর্শ করেছিল বাংলার সুপ্ত তারুণ্যকে।

বংশ পরিচয় ও শিক্ষা

ডিরোজিও জন্মেছিলেন একটা সামান্য পর্তুগিজ ফিরিঙ্গি পরিবারে। এই ফিরিঙ্গিদের (এদের ইউরেশিয়ানও বলা হয়, বর্তমানে সাধারণভাবে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান) আজও আমরা অনেকেই অনাত্মীয় বলেই মনে করি। তাঁদের সাথে ভাবের স্বাভাবিক আদান-প্রদান আজও বৃহত্তর সমাজের নেই। অথচ ডি়রোজিও উঠে এসেছিলেন এইরকম একটি সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার থেকেই। বংশগত কোন গৌরব কিংবা উত্তরাধিকারসূত্রে পাবার মত মূল্যবান কিছু ডিরোজিওর ছিল না। যদিও তাঁর পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিও (১৭৭৯-১৮৩০) কলকাতার তদানীন্তন ফিরিঙ্গি সমাজে মোটামুটি একজন সঙ্গতিসম্পন্ন সচ্ছল মানুষই ছিলেন। তিনি সেসময়ের বিখ্যাত সওদাগরি প্রতিষ্ঠান জেমস স্কট অ্যান্ড কোম্পানিতে বেশ উচ্চপদে চাকরি করতেন। লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িটি ছিল তাঁরই নিজস্ব অর্থবলে করা। ফ্রান্সিস ডিরোজিওর পিতা অর্থাৎ হেনরী ডিরোজিওর পিতামহ মাইকেল ডিরোজিওর (১৭৪২-১৮০৯) তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের St. John's Baptismal Register-এ দেখা যায়, মাইকেল ডিরোজিওকে উল্লেখ করা হয়েছে একজন 'নেটিভ প্রোটেস্ট্যান্ট' হিসাবে। যদিও কয়েক বছর পর ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের Bengal Directory-তে তাঁর পরিচয় উল্লিখিত হয়— 'A portuguese Merchant and Agent'. ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস বিয়ে করেন সোফিয়া জনসনকে। হেনরী ডিরোজিও ছিলেন এঁদের দ্বিতীয় সন্তান। হেনরী ছাড়াও ফ্রান্সিস ও সোফিয়ার আরও চারটি ছেলে-মেয়ে ছিল। কিন্তু হেনরীর মতনই তাঁদের প্রত্যেকেরই আয়ু ছিল অত্যন্ত অল্প দিনের। শোনা যায়, হেনরীর বড় ভাই ফ্রাঙ্ক-এর সঙ্গীত প্রতিভা

ছিল। কিন্তু নিষ্কর্মা ও উচ্ছৃঙ্খল হিসাবে কলকাতার ফিরিঙ্গি সমাজে তাঁর কুখ্যাতিও ছিল যথেষ্ট। কুড়ি বছর বয়সে কোন এক কারণে তিনি আত্মহত্যা করেন। ডিরোজিওর বড় বোন সোফিয়া (জুনিয়র) মারা যান সতেরো বছর বয়সে। পরের বোন আমেলিয়ার মৃত্যু হয় ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বাইশ বছর বয়সে। এবং পরের বছর অর্থাৎ ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে যখন সবচেয়ে ছোট ভাই ক্লডিয়াসের মৃত্যু হয় তখন তাঁরও বয়স মাত্র বাইশ বছর। চার ভাই-বোনের মধ্যে একমাত্র ছোটবোন আমেলিয়ার অন্তরঙ্গ সাহচর্যই ডিরোজিও তাঁর পারিবারিক জীবনে লাভ করেছিলেন। আমেলিয়ার চরিত্রের মাধুর্য এবং তাঁর মার্জিত স্বভাবের জন্য ডিরোজিও তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। ছোট ভাই ক্লডিয়াসও তাঁর প্রিয় ছিলেন। শিক্ষালাভের জন্য ক্লডিয়াসকে পাঠানো হয়েছিল স্কটল্যান্ডে। ডিরোজিওর বয়স যখন মাত্র ছয়, তখন তাঁর মা সোফিয়ার মৃত্যু হয়। এরপর পিতা ফ্রান্সিস বিয়ে করেন মিস আনা মারিয়া রিভার্স নামে আরেকজন ব্রিটিশ মহিলাকে। আনা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন। তাঁর অন্য আরও অনেক গুণও ছিল। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ডিরোজিওর পিতা ফ্রান্সিস মারা যান ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর, অর্থাৎ ডিরোজিওর মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে।

ডিরোজিওর বংশ পরিচয় বলতে গেলে এই। যে ফিরিঙ্গি সমাজে তিনি জন্মেছিলেন তার অবস্থা তখন, না ঘরকা না ঘাটকা। রক্তের দিক থেকে ইউরোপীয় ও ভারতীয় দু'তরফেই যোগাযোগ থাকলেও দুদিকেই তারা ছিল অবহেলিত, উপেক্ষিত। দেশীয় সমাজ তাদের গ্রহণ করেনি। ইউরোপীয় সমাজের কাছেও তারা ছিল উপহাসের পাত্র। যদিও রয়াল চার্টারে তাদের গণ্য করা হয়েছিল 'হিন্দু বা মুসলমানদের ন্যায় নেটিভ' বলে। সেসময় কলকাতার খাঁটি ইউরোপীয়ানরা ফিরিঙ্গিদের কি চোখে দেখত তা বোঝা যায় হাচিসন সাহেবের একটি উক্তি পাঠ করলে। হাচিসন লিখেছেন-- "জাতি হিসাবে তারা ভালো-ভালো পোশাক পরতে ভালবাসে। বড়ই অনুকরণ প্রিয়। নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে বড়ই সচেতন। হাস্যোদ্রেককারী অলীক মর্যাদাবোধ এত প্রবল যে, রাইটারের চাকরি ছাড়া আর কোন চাকরি তারা নেয় না। জুতো তৈরি, দর্জির কাজ, ছুতোর,

রাজমিস্ত্রী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অর্থকরী কাজে তারা হাত দেয় না। অথচ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিভার অভাব নেই।'' আরেক জন, 'স্কেচেস অফ ইন্ডিয়া' গ্রন্থের গ্রন্থকার, যিনি ১৮১১-১৮১৪ সাল পর্যন্ত এদেশে ছিলেন, লিখেছিলেন— 'এদের আছে কী? অর্থ নেই, মর্যাদা নেই, আত্মোৎসর্গের কোন সুযোগ নেই। এই সর্বরিক্তের দল বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। এ যেন এক নাট্যমঞ্চ, যেখানে সবাই সবকিছুর আশা করতে পারে। কিন্তু ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার পুরাতন নগণ্যতায় ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।'' বাস্তবিক, আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিকাশের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ইউরেশিয়ানদের কাছে। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে নতুন আইন জারি করে এদের সরকারি চাকরিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। নিজ সম্প্রদায়ের এই বিরাট সংখ্যক হতভাগ্য মানুষের মর্যাদাহীন, ভবিষ্যতহীন জীবন আজীবন আন্দোলিত করেছিল ডিরোজিওকে। তাদের জীবনের সেই অনিশ্চয়তা, সেই উদ্বেগ ঘুরে ফিরে গ্রাস করেছিল তাঁকেও। তাই হয়ত "To my brother in Scotland' কবিতায় তিনি একদিন লিখেছিলেন—

Th' uncertain future wakes the fear
I feel, but must not, dare not tell —

জীবনীশক্তি শুষে নেওয়া প্রতিকূল এই সমাজ পরিবেশ কোন প্রতিভা বিকাশের সহায়ক ছিল না। কিন্তু ডিরোজিও এখান থেকেই উঠে এসেছিলেন। এর পেছনে রহস্য কি? কোথায় পেয়েছিলেন তিনি সেই শিক্ষা যা তাঁকে গড়ে তুলেছিল এইভাবে? এই শিক্ষার উৎস ছিলেন একজন শিক্ষক, ডেভিড ড্রামন্ড, যাঁর স্কুলে ছয় বছর বয়সে শিক্ষালাভের জন্য পাঠানো হয়েছিল ডিরোজিওকে। স্কুলটির নাম 'ধর্মতলা অ্যাকাডেমি'। সেসময় কলকাতায় এদেশীয়দের ইংরেজের অধীনে চাকরি-বাকরি বা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে কাজ চালানো গোছের ইংরেজি শিক্ষার জন্য আরও অনেক স্কুলই গড়ে উঠেছিল। যেমন — চিৎপুরে শেরবোর্ন সাহেবের স্কুল, বৈঠকখানায় হাটম্যানের স্কুল, আমড়াতলায় মার্টিন বাউলের স্কুল ইত্যাদি। কিন্তু এইসব স্কুলের সাথে পার্থক্য ছিল ড্রামন্ডের স্কুলের।

অন্যান্য স্কুলে যেখানে শুধুমাত্র ওয়ার্ড বুক ও স্পেলিং বুক থেকে লিস্ট করে নিত্যব্যবহার্য কিছু ইংরেজি শব্দ ও তাদের অর্থ শেখানো হত, সেখানে ড্রামন্ড তাঁর স্কুলে ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন শেক্সপীয়ারের নাটক। শুধু তাই নয়, ড্রামন্ডের শিক্ষায় আরও অনেক কিছুই ছিল, যা এক কথায় বিস্ফোরক।

আসলে ড্রামন্ডের মানস প্রকৃতিই ছিল অন্য রকমের। স্কটল্যান্ড থেকে তিনি এদেশে এসেছিলেন। পিঠে একটা কুঁজ ছিল বলে লোকে বলত 'কুঁজো স্কচম্যান'। তিনি ছিলেন বিখ্যাত পজিটিভিস্ট দার্শনিক ডেভিড হিউমের গোঁড়া ভক্ত। হিউমের মতই তিনি ছিলেন ঘোর সংশয়বাদী। যুক্তি-বিচারের কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না করে কোনকিছুই তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মত ছিল, মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাই তার যাবতীয় জ্ঞানের উৎস। তিনি মনে করতেন, ব্যক্তি মানুষ মাত্রেই স্বাধীন। রুচি বিকৃত না করে, সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার না করে এই জাগতিক জীবনকে উপভোগ করার অধিকার সকলেরই আছে। মানুষের এই অধিকারের জগতে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। দৃশ্যমান এই জগতের উর্ধ্বে ঈশ্বর কোথাও আছেন কি নেই— এই প্রশ্নটাই অবান্তর। কারণ মানুষই সত্য। মানুষই সুন্দর। মানুষের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। বস্তুত জীবন ও জগত সম্পর্কে ড্রামন্ডের এই উপলব্ধি মাঝে মধ্যেই প্রতিফলিত হত তাঁর শিক্ষাদানেও। এই শিক্ষা গভীরভাবে দাগ কেটে দেয় ডিরোজিওর মানসভূমিতে। ড্রামন্ডের স্কুলে ওই অল্প বয়সেই ডিরোজিও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। যদিও সাহিত্যের পুরনো ক্লাসিক্‌সগুলো তাঁকে খুব একটা টানত না। তিনি পড়তে ভালোবাসতেন নবযুগের আধুনিক চিন্তার বাহক বিভিন্ন লেখকদের রচনা। জ্ঞান অর্জনের এই প্রক্রিয়া তাঁর আজীবন জারি ছিল।

১৮১৫ থেকে ১৮২৩, এই আট বছর ডিরোজিও ড্রামন্ডের স্কুলে ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দেই কলকাতার সম্ভ্রান্ত বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় এবং হাইড ইস্ট, ডেভিড হেয়ারের মত দুয়েক জন ইংরেজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছে বাংলা তথা ভারতবর্ষের আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ। এবং ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ডিরোজিও যখন তাঁর শিক্ষা

জীবন শেষ করে ড্রামন্ডের স্কুল থেকে বেরিয়ে আসছেন, সেই বছরই এদেশে প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবীর পরিবর্তে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে জোরালো সওয়াল করে গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে তাঁর ঐতিহাসিক চিঠি লিখছেন রামমোহন। এরপর ১৮২৩ থেকে ১৮৩৫ অর্থাৎ মেকলে এদেশে আসা পর্যন্ত দেশের শিক্ষা কোন পদ্ধতিতে চলবে তা নিয়ে প্রাচ্যপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডা চলেছে। অবশেষে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেকলের সুপারিশের ভিত্তিতে কোম্পানির সরকার ইংরেজি পদ্ধতিতেই এদেশীয়দের শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে এটা পরিষ্কার, এসবের বহু আগেই ড্রামন্ডের স্কুলে পড়বার সময়ই ডিরোজিও তাঁর শিক্ষাদর্শ স্থির করে নিয়েছিলেন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন তখন আমরা এর পরিচয় পাই।

উন্মেষ পটভূমি

কিন্তু ড্রামন্ডের এই শিক্ষাও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারত ডিরোজিওর জীবনে। কারণ যেকোন যুগেই নবযুগের চিন্তা, আদর্শ ব্যক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে সংগ্রামের মহৎ ইতিহাস রচনা করে তখনই যখন সমাজের কদর্য প্রাচীন দেশাচার, অন্ধতা, গোঁড়ামি এবং মানবদ্রোহী বিভিন্ন রীতিনীতির বিরুদ্ধে মুক্তির একটা সার্বিক সামাজিক আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয় সেই প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরেই, এবং সেই আকাঙ্ক্ষা স্পর্শ করে ব্যক্তিকে। ড্রামন্ডের শিক্ষা যে সোনার ফসল ফলিয়েছিল ডিরোজিওর জীবনে তার কারণ ছিল এই, এদেশের অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন সামন্তী সমাজ, এদেশের মানুষের অজ্ঞানতা, নীতি-নৈতিকতার চূড়ান্ত অধঃপতন, এদেশের পরাধীনতা যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছিল তাঁকে। তিনি এর হাত থেকে মানুষের মুক্তি কামনা করতেন।

যে ফিরিঙ্গি সমাজে ডিরোজিওর জন্ম, তার ভবিষ্যত বলে কিছু ছিল না। আর এর বাইরের বৃহত্তর হিন্দু সমাজটা ছিল মানববৈরী হাজারো শৃঙ্খলে আবদ্ধ। অজ্ঞানতার দাপট এতটাই ব্যাপক ছিল যে নীতিহীন জীবনাচরণে অভ্যস্ত মানুষ জীবনের সার্থকতা খুঁজে বেড়াত অন্তঃসারশূন্য ধর্মীয় আড়ম্বরে। অথচ এ নিয়ে সেরকম কোন গুরুতর রকমের সংশয়, সেরকম কোন প্রশ্ন কখনওই উত্থাপিত হত না এদের মধ্যে। এরা দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, দোলযাত্রার আবির, রথযাত্রার গোল— এই সব নিয়েই দিনগুলি কাটিয়ে দিত মনের আমোদে, পরম উল্লাসে।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে সে সময় কলকাতার ধনী হিন্দুরা যে পরিমাণ অর্থের অপব্যয় করত তা ভাবলে গায়ে রীতিমত কাঁটা দেয়। পুজোয় সাহেবদের আমন্ত্রিত করে কে কত বেশী ঢালাও খানা-পিনা, মদ ও কুরুচিপূর্ণ বাঈজী নাচ-

গানের আসর বসাতে পারে তারই জন্য কুৎসিত জঘন্য প্রতিযোগিতা চলত এদের মধ্যে। কারণ এটাই ছিল তখন সমাজে মান্য বলে পরিগণিত হবার একমাত্র পথ। বলাবাহুল্য, এর ফলে অনেকেই নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। আর শুধু তো দুর্গাপূজাই নয়, বিয়ে ও শ্রাদ্ধ উপলক্ষেও উন্মত্তের মত টাকা ওড়াত এরা। সেই আমলেই 'সমাচার দর্পণ' কিংবা 'ইন্ডিয়া গেজেট'-এর মত সংবাদপত্রগুলিতে এই অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে, দেশের ধনাঢ্য লোকেরা শিক্ষাবিস্তারের মত মহৎ কাজে ব্যয় করা অপেক্ষা 'নাচ ও রঙ্গে অধিক টাকা ব্যয়' করাটাকেই পরম শ্লাঘার বিষয় বলে মনে করেন। কারণ, সমারোহসহকারে বিয়ে দেওয়া কিংবা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করাতে লোকের কাছে যেরকম সুখ্যাতি পাওয়া যায় তেমনটি আর অন্য কোন কাজেই মেলে না। সমাচার দর্পণের একটি সংবাদ (২৪ অক্টোবর ১৮১৮) থেকে জানা যায়, মহারাজা গোপীমোহন দেবের শ্রাদ্ধে তাঁর পুত্রেরা খরচ করেছিলেন প্রায় তিন লক্ষ টাকা। আরেকটি সংবাদ থেকে জানা যায় রামরত্ন মল্লিকের ছেলের বিয়েতে সেই আমলেই খরচ হয়েছিল প্রায় আট লক্ষ টাকা। (সমাচার দর্পণ। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০) বলাবাহুল্য, উড়িয়ে দেওয়া এই বিপুল অঙ্কের টাকা এদের কারুরই ব্যক্তিগত অর্জন ছিল না। কোম্পানির আমলের শুরুর দিকে দেওয়ানি কিংবা মুচ্ছুদ্দিগিরি ক'রে বাপ-পিতামহের ক'রে যাওয়া ধনের উপরেই ফুটানি দেখাত এরা। এরাই ছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাবু কালচারের জনক ও পোষক। বাস্তবিক, যে সময়ে ডিরোজিওর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা, সেই সময়ে শহর কলকাতার বাতাস ছিল বাবু কালচারে বিষাক্ত। সে সময়ের একটি ছড়ায় আছে—

ঘুড়ী তুড়ী জস দান,
আখড়া বুলবুলি মণিয়া গান।
অষ্টাহে বন ভোজন,
এই নবধা বাবুর লক্ষণ॥

এইসব বাবুদের ঠাঁট-বাঁট, চাল-চলন, বিদ্যাবত্তার অভিমান— সমস্তই ছিল কুৎসিত এবং হাস্যকর। সমাচার দর্পণের ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮২১ তারিখের

একটি সংখ্যায় এদের উদ্দেশ্য করে জনৈক পত্রলেখক লিখেছিলেন—

"(এরা) গোটা কতক বিলাতী অক্ষর লিখিতে শিখেন, আর ইংরাজী কথা প্রায় দুই তিন শত শিখেন। নোটের নাম লোট, বডিগার্ডের নাম বেনিগারদ, লৌরি সাহেবকে বলেন নৌরি সাহেব। এই প্রকার ইংরেজী শিখিয়া সর্ব্বদাই হুট (what), গোটেহেল (Go to hell), ডোনকের (Don't care) ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা আছে; আর... সকলকেই ইংরেজী চিঠী লেখেন। তাহার অর্থ তাঁহারাই বুঝেন। কোন বিদ্বান্ বাঙ্গালি কিম্বা সাহেব লোকের সাধ্য নহে যে সে চিঠী বুঝিতে পারেন"।

পত্রলেখক আরও লিখেছিলেন—

"(এদের) সুপুরুষ হইতে মহাসাধ। মনে ভাবেন, বড় মানুষের ঘরে জন্মিয়াছি, যদি সৌন্দর্য্য না দেখাই তবে লোকে ছোট লোক কহিবেক। ইহাতে করিয়া স্বর্ণ মুক্তা হীরা প্রভৃতির অভরণ অর্থাৎ দোনরি তেনরি পাঁচনরি হার, বাজুবন্দ উপলক্ষে ইষ্ট কবচ, গোট, চাবির শিকলি ইত্যাদি গহনা ও কালাপেড়ে্যে রাঙ্গাপেড়ে্যে শালপেড়ে্যে কাঁকড়াপেড়ে্যে... ধুতি পরিধান করেন। (কিন্তু) এসকল স্ত্রীলোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতে তোমাকে সুন্দর কোন প্রকারে দেখা যায় না ও বড় লোক কহা যায় না। বরং ছোটলোক বিলক্ষণ সাবুদ হয়। আর ঐ নটবর বেশ বিন্যাস দেখিলে বোধ হয় না যে কোন সভায় কিম্বা সাহেব লোকের দরবারে যাইতেছেন, স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বেশ্যালয়ে গমন হইতেছে"।

ইচ্ছে করলেই এই বাবু কালচারের হাওয়ায় ডিরোজিও নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি অন্য পথে গেলেন। কেন? কারণ এই প্রচলিত সমাজের প্রত্যেকটি অন্যায় বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দিয়েছিল তাঁর অন্তরে। এই কলকাতা শহরেই আশৈশব তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন দাসব্যবসার মত একটি জঘন্য বর্বর প্রথা। প্রত্যক্ষ করেছিলেন এদেশের হিন্দু বিধবা নারীদের দুর্দশা। নারীকে পশুর চাইতেও অধম মনে করে ধর্মান্ধ হিন্দু সমাজপতিদের সতীদাহের পক্ষে নির্লজ্জ ওকালতি, তা-ও দেখেছিলেন তিনি। তিনি দেখেছিলেন, দেশাচারের মোহে মা কিভাবে তার সন্তানকে গঙ্গায় অথবা রথের চাকার নীচে বিসর্জন দেয়। দেখেছিলেন, কিভাবে এদেশের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বাবুরা পূজা-পার্বণ,

আমোদ-উৎসব, নীতিহীন নানান কদাচারে অপচয় করে লক্ষ লক্ষ টাকা। যে এন্টালি অঞ্চলে ডিরোজিওর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা, সেই এন্টালিতে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্তও চড়কের বীভৎস সমারোহ ছিল বছরের একটি উল্লেখযোগ্য স্বাভাবিক ঘটনা। শুধু এন্টালি নয়, ধর্মতলায় ড্রামন্ডের স্কুল থেকে সামান্য দূরে চৌরঙ্গিতেও ধূমধাম সহকারে প্রত্যেক বছর অনুষ্ঠিত হত চড়ক। পাপমুক্তির জন্য শরীরের বিভিন্ন স্থানে শিক গেঁথে, জিভ ফুঁড়ে গাজনের সন্ন্যাসীদের উদ্দাম আদিম নৃত্য জন্মাবধি ডিরোজিও-ও নিশ্চয়ই দেখেছেন। এদেশের মানুষের এই সমস্ত কুসংস্কার ক্ষোভে, যন্ত্রণায় অস্থির করে দিত তাঁকে। কারণ, তিনি নিজেকে এদেশেরই সন্তান বলে মনে করতেন। "অন্যান্য ফিরিঙ্গি রা যেমন বলে— 'মোদের বিলাত', তিনি সেরূপ বলিতেন না। এই দেশকে তিনি স্বদেশজ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা বোধ করিতেন।" (রাজনারায়ণ বসু : সেকাল আর একাল।)

বাস্তবিক, যে সমাজে ডিরোজিও জন্মেছিলেন তার আর তখন কোন ক্ষমতাই ছিল না মানুষকে ভালো কিছু দেওয়ার, সুন্দর কিছু দেওয়ার। যদিও এই নিরাশাজনক পরিস্থিতিই তখন দেশের একমাত্র চিত্র ছিল না। এর বিপরীতে অন্ধকারের জাল বিদীর্ণ করে মুক্তির একটা আকাঙ্ক্ষাও ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছিল দেশের মানুষের মনে। এই আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করেই এদেশের সমাজে ভোরের প্রথম সূর্যের মত একদিন রামমোহনের অভ্যুদয়। ডিরোজিওর আবির্ভাব সেই রামমোহন যুগেই। সমাজ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা স্পর্শ করেছিল তাঁকেও। তারই সাথে ড্রামন্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে তিনি যেটা পেয়েছিলেন তা হল জীবনে চলার পথের এক নতুন দিশা।

কাব্য প্রতিভার উন্মেষ

ড্রামন্ড নিজে কবি ছিলেন। সাংবাদিকতাও করতেন। সমসাময়িক ইংরেজি পত্র-পত্রিকাগুলিতে তিনি নিয়মিত লিখতেন কবিতা ও সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ। স্বসম্পাদনায় প্রকাশ করতেন একটি সাপ্তাহিক পত্র, Weekly Examiner—A Journal of Politics, News and Literature. ডিরোজিও তাঁর কবিতা লেখার প্রথম প্রেরণা সম্ভবত ড্রামন্ডের কাছ থেকেই পেয়ে থাকবেন। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি স্কুলের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে সহপাঠীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি নাটকের ভূমিকাস্বরূপ তিনি 'Prologue' নামে একটি কবিতা পাঠ করেন। এটাই ছিল সম্ভবত তাঁর প্রথম রচনা। কবিতাটির মধুর কৌতুকরস এবং তার চমকপ্রদ উপস্থাপনা সেদিন মুগ্ধ করেছিল উপস্থিত সকলকেই। ডিরোজিও এতে লিখেছিলেন—

As new fledg'd birds, while yet
unus'd to soar,
Tremble the airy regions to
explore,
Mistrust their pow'r, yet doubting
dare to fly,
And brave the dazzling brilliance
of the sky —
So, the poor train who now are
to appear,
Shrink e're they try — preplex'd

'tween hope and fear
And tho' your smiles bespeak
indulgence certain,
Still, still they dread the rising
of the curtain.

মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সী এক বালকের এই কবিত্বশক্তি ছিল রীতিমত বিস্ময়কর! দু'দিন পর ডক্টর জন গ্রান্টের সুপ্রসিদ্ধ 'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় কবিতাটির ছন্দোবদ্ধ সুনির্দিষ্ট ভাব সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বলা যেতে পারে, ডিরোজিওর এই কবিতাটিই ছিল এই উপমহাদেশে ইন্দো-ইংলিশ সাহিত্যের সর্বপ্রথম নিদর্শন। ডিরোজিওর আগে অবশ্য রামরতন চক্রবর্তী নামে আরেক জন ভারতীয়ের নাম পাওয়া যায় যিনি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতেরা এই রামরতন চক্রবর্তীর আসল পরিচয় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

সে সময় কলকাতার ইংরেজি শিক্ষার স্কুলগুলিতে প্রায়ই সমাজের গণ্যমান্য ইউরোপিয়ান সাহেবরা স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিদর্শক হিসাবে আমন্ত্রিত হতেন। ডক্টর জন গ্রান্টকেও এই উপলক্ষ্যে বেশ কয়েকবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ড্রামন্ডের স্কুলে। বলাবাহুল্য, এই সময় ডিরোজিও তাঁর নিজস্ব প্রতিভার গুণে নজরে পড়ে গিয়েছিলেন গ্রান্টের। পরবর্তীকালে তাঁদের এই পরিচয় রূপান্তরিত হয়েছিল দুজনের মধ্যে গভীর সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্কে। গ্রান্ট হয়ে উঠেছিলেন ডিরোজিওর সাহিত্যচর্চার প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

ড্রামন্ডের স্কুলে শিক্ষালাভের পর ডিরোজিওকে পাঠানো হয় তাঁর পিতার কর্মস্থল জেমস স্কট অ্যান্ড কোম্পানিতে চাকরি করার জন্যে। হয়তো পিতা ফ্রান্সিস এভাবেই তাঁর পুত্রকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খুব বেশীদিন চাকরি করা ডিরোজিওর পক্ষে সম্ভব হল না। কারণ কেরানীর নীরস একঘেয়ে কাজের জন্য তিনি ছিলেন একেবারেই অনুপযুক্ত। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে

তিনি ভাগলপুরে তাঁর মাসীর কাছে চলে গেলেন। তাঁর মাসীর বিয়ে হয়েছিল সেখানকার এক ধনী নীলকর সাহেব আর্থার জনসনের সঙ্গে। ডিরোজিও বছরখানেক তাঁদের কাছে ছিলেন। তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার বিকাশে এই সময়টুকু ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিহারের উত্তরভাগে গঙ্গার তীরে ছোট্ট মফস্বল টাউন ভাগলপুর। ডিরোজিওর প্রকৃত কাব্যচর্চার সূত্রপাত এখানেই। এখানকার শান্ত, নির্জন পরিবেশ এবং পাহাড়, জঙ্গলে ঘেরা অকৃত্রিম বন্য নিসর্গ গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল তাঁকে। এতদিন ড্রামন্ডের স্কুলে যে পুঁথিগত বিদ্যা তিনি অর্জন করেছিলেন তাকেই যেন আরও প্রত্যক্ষভাবে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করার এক অখণ্ড অবসর তিনি পেলেন এখানে। তাঁর এই সময়কার মানসিক অবস্থা তাঁর নিজের ভাষাতেই বলা চলে—

It is an hour of watchfulness and thought;
It is the chosen season when are wrought
The fairest pictures ever Fancy drew;...

জনমানবশূন্য গঙ্গার তীরে একা দাঁড়িয়ে তিনি তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতেন দূরের পাহাড়শ্রেণীর দিকে। কখনও দেখতেন দিনান্তের শেষ রশ্মিটুকু ছড়িয়ে সূর্য ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে। একটি জেলে নৌকা একাকী বাঁধা রয়েছে তীরে। আর তার মাঝিটি কর্মক্লান্ত শরীরে ভালোবাসার মানুষের টানে কখন যেন ফিরে গেছে তার কুটিরে। প্রকৃতির কোলে লালিত মানুষের এই সহজ জীবনধারার ছবি দেখতে দেখতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত ডিরোজিওর কবি কল্পনা। তাঁর হৃদয়ের অন্তর্লীন আবেগ তখন রূপ পেত ছন্দোময় ভাষার অনুষঙ্গে—

What holy silence gathers now around !
All, all is still, save the small silver sound
Which issues from the wave that wanders by,

Soft as an angel's harp, or maiden's sigh :—
O ! I could listen to it till my soul
In boundless floods of ecstasy might roll.

ভাগলপুর থেকে নিজের লেখা কবিতা ও বিভিন্ন গদ্য রচনা ডিরোজিও কলকাতায় গ্রান্টের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। সেগুলি 'জুভেনিস' (Juvenis) ছদ্মনামে প্রকাশিত হত ইন্ডিয়া গেজেটে। এই সময় থেকে মূলত গ্রান্টেরই উৎসাহে ডিরোজিওর সাহিত্য সাধনা অবাধগতিতে এগিয়ে চলতে থাকে। ডিরোজিও এই সময় তাঁর কাছ থেকে শিখে নেন সাংবাদিকতারও কিছু কলা-কৌশল। 'ইন্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত জুভেনিস-এর রচনাগুলি সেসময় কলকাতায় অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গ্রান্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ডিরোজিওর সাহিত্য প্রতিভার শক্তি। তিনি তাঁকে কলকাতায় ফিরে আসার আহ্বান জানালেন। শুধু তাই নয়, সদ্য বিকাশোন্মুখ একজন কবির কাছে যে কাজ সবচেয়ে দুঃসাহসিক, সেই নিজের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ, সে ব্যাপারেও ডিরোজিওকে উৎসাহিত করেছিলেন সম্ভবত তিনিই। ডিরোজিওর কাব্য সংকলন 'Poems of Henry Louis Vivian Derozio : A Forgotten Anglo-Indian Poet'-এর ভূমিকায় সংকলনের সম্পাদক ব্র্যাডলে-বার্ট অন্তত এরকমই আমাদের জানিয়েছেন।

কলকাতায় ডিরোজিও প্রত্যাবর্তন করেছিলেন খুব সম্ভব ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কোন একটা সময়ে। এরপর তিনি গ্রান্টের 'ইন্ডিয়া গেজেট'-এ সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। পাশাপাশি, ওই একই বছরে তিনি যোগ দেন হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদেও। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর যোগদানের বিষয়টি জানা যায় সেসময় শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত মিশনারীদের পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' থেকে। এ প্রসঙ্গে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মে তারিখে একটি সংবাদে সমাচার দর্পণ লেখে—

"ইংরেজি পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক একজন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুইজন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।"

ডিরোজিওর বয়স তখন সতেরো বছর।

১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে ডিরোজিওর প্রথম কাব্য সংকলন 'Poems' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন গ্রান্টকে। প্রকাশের সাথে সাথেই তা প্রশংসা লাভ করে কলকাতার সাহিত্য রসিক মহলের। ডিরোজিওর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে অচিরেই। এই সংকলনের প্রথম কবিতা 'The Harp of India' ছিল এদেশে কোন ভারতীয় কবির লেখা 'সর্বপ্রথম স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা'। স্বদেশের জন্য কবির সুগভীর হৃদয়-বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল কবিতাটির ছত্রে ছত্রে। এর শেষ লাইনটিতে ডিরোজিও লিখেছিলেন—

Harp of my country,
let me strike the strain !

উপেক্ষিতা মাতৃভূমির ছিন্নবীণায় ডিরোজিও সেদিন আবার নতুন করে সুর বাঁধতে চেয়েছিলেন।

ডিরোজিওর দ্বিতীয় কাব্যগন্থ 'The Fakeer of Jungheera, A Metrical Tale And Other Poems' প্রকাশিত হয় পরের বছর, অর্থাৎ ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে। এই 'ফকির অফ জঙ্গীরা'ই তাঁর সর্বাধিক আলোচিত ও প্রসিদ্ধ কাব্য। এই কাব্যের রসদ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ভাগলপুরের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সেখানকার প্রচলিত একটি লোককথা থেকে। এই কাব্যগ্রন্থেরও সূচনায় তিনি তাঁর বিখ্যাত 'To India — My Native Land' নামক যে অনবদ্য সনেটটি গ্রন্থিত করেন, তাতেও আমরা লক্ষ্য করি তাঁর সেই উত্তুঙ্গ স্বদেশপ্রেম ঝংকৃত হয়ে উঠেছে।

হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিও

একদিকে কাব্য, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার চর্চা, অন্যদিকে হিন্দু কলেজে শিক্ষাদান —দুই-ই চলছিল সমান গতিতে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ঝড় ঘনিয়ে উঠল তাঁকে কেন্দ্র করে। সেই ঝড়ে থর থর করে কেঁপে উঠল একটা নিশ্চল, স্থবির সমাজ। এবং শেষপর্যন্ত তারই প্রতিক্রিয়ায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তাঁর জীবন। বাস্তবিক, বাংলার সমাজ পটভূমিকায় সেদিন নবযুগের একজন আদর্শ শিক্ষাগুরু হিসাবে তাঁর উত্থান এবং তাঁকে কেন্দ্র করে একদল সত্যসন্ধানী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণের চোখ ঝলসানো সমাবেশ খুব একটা সামান্য ঘটনা ছিল না। হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসাবে ডিরোজিও একটা চিন্তাবিপ্লব শুরু করে দিলেন সমাজের বুকে। এর ফলে কায়েমী স্বার্থের ধারক বাহক রক্ষণশীল সমাজনেতাদের যে বীভৎস আর্তনাদ সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল বাংলার আকাশ-বাতাস জুড়ে তার তুলনা বোধ করি আর কিছু ছিল না। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "এরূপ ব্যাপার তৎপূর্ব্বে বা তৎপরে বঙ্গদেশে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই।"

১৮২৬ থেকে ১৮৩১ — এই পাঁচ বছর ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করেছিলেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের চাপে কলেজের ম্যানেজিং কমিটি তাঁকে কলেজ থেকে অপসারিত করে। এরপর মাত্র আট মাসের ব্যবধানে ওই বছরেরই ২৬ ডিসেম্বর মৃত্যু হয় তাঁর। ডিরোজিওর জীবনের এই পাঁচ বছর প্রকৃতপক্ষে বাংলায় আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাস। এই পাঁচ বছর এদেশের সমাজপ্রগতির এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিলগ্নে প্রাচীন ও নবীন, প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার এক তুমুল দ্বন্দ্ব সংঘাতের ইতিহাস।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, ডিরোজিও তখন ডেভিড ড্রামন্ডের স্কুলের ছাত্র। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, সন্দেহ নেই। তাঁরা চেয়েছিলেন এইরকম একটি কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যের উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাহিত করে দিতে। তাঁদের মতে, হিন্দু কলেজ হবে 'The main channel by which real knowledge may be transferred from its European sources into the intellect of Hindusthan'. ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের কলেজের রিপোর্টেও দেখা যায়, হিন্দু কলেজের শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে উইলসন সাহেব লিখছেন— "The general result of the operations of the Hindu College is to give the students a considerable command of the English language, to extend their knowledge of History, Geography and to open to them a view of the objects and means of Sciences". ফলে এটা পরিষ্কার, কলেজের উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষকদের এই উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনার সাথে কোন বিরোধ ছিল না ডিরোজিওর শিক্ষাদর্শের। কারণ তিনিও চেয়েছিলেন এমন শিক্ষা এদেশের তরুণ ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে যাতে তাদের ঘুম ভাঙে, যাতে প্রাচীন শিক্ষার ঘোলাটে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে তারা সিঞ্চিত হতে পারে নতুন জ্ঞানের আলোকে। কিন্তু দেখা গেল উদ্দেশ্যের এই প্রাথমিক অভিন্নতা সত্ত্বেও একদিন অত্যন্ত অন্যায়ভাবে 'ছাত্রদের তিনি কুশিক্ষা দিচ্ছেন'— এই অভিযোগে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হল তাঁকে। অপরাধীর বেশে দাঁড় করানো হল সমগ্র হিন্দুসমাজের সামনে। কেন? কারণ একদিন যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই কলকাতার সম্ভ্রান্ত হিন্দু ধনীরা কলেজ প্রতিষ্ঠা করে থাকুন না কেন, ডিরোজিও যখন নবযুগের সেই আপসহীন বিপ্লবাত্মক আদর্শ জীবনে ও সমাজে বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার প্রকৃত স্বরূপ তাঁদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন তখন তিনি নতুন চিন্তাটি গ্রহণযোগ্য হল কিনা, তা গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা কতটা তা ভেবে দেখেন নি। সত্যের পিছনে সামাজিক শক্তিগুলিকে সংহত করার যে কাজ যে প্রজ্ঞার সঙ্গে পরে বিদ্যাসাগর করেছিলেন, ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গলের মধ্যে তা ছিল না। ফলে বৃহত্তর হিন্দু

সমাজের কাছে তা অসহিষ্ণুতা ও প্রাচীনের প্রতি অবজ্ঞা থেকে উদ্ভুত আঘাত হিসাবেই পরিগণিত হয়েছিল।

বিদ্যায় বুদ্ধিতে, জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে কিংবা জীবনের অভিজ্ঞতায় ডিরোজিওর চাইতে বড় সেসময় হিন্দু কলেজে অনেক শিক্ষকই হয়ত ছিলেন। কিন্তু আদর্শকে জীবনে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ডিরোজিও ছিলেন অগ্রণী। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল তাঁর কবি-হৃদয়ের এক অনবরুদ্ধ আবেগ। বস্তুত, কবির অন্তর্দৃষ্টি নিয়েই ডিরোজিও জীবন ও জগতকে দেখেছিলেন। হিন্দু কলেজে তাঁর শিক্ষাদান, তাঁর সমাজমুক্তির আকাঙ্ক্ষা, তাঁর বিদ্রোহ, তাঁর যুক্তিবাদিতা, তাঁর সংশয়, তাঁর স্বদেশপ্রেম — সমস্ত কিছুরই অন্তরালে ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর এই কবিসত্তাই। এই কবিসত্তার প্রতিভাদীপ্ত প্রকাশ সেদিন মুগ্ধ করেছিল তাঁর ছাত্রদের। ফলে হিন্দু কলেজে পদার্পণ করা মাত্র চুম্বক যেমন লোহাকে টানে তেমনি তিনি আকর্ষণ করলেন কলেজের ছাত্রদের। তিনি তাদের কাছে অচিরেই হয়ে উঠলেন নবযুগের একজন আদর্শ শিক্ষক, তাদের নেতা এবং অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁর ব্যক্তিত্বের চৌম্বক আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ছিল না কারও। এই যে শ্রদ্ধা উদ্রেককারী অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, কি ছিল তার স্বরূপ? এর একদিকে যেমন ছিল প্রথম যৌবনের সেই দুর্দমনীয় আবেগ, অফুরন্ত জীবনীশক্তি এবং একটি আনন্দোজ্জ্বল উচ্ছ্বসিত হৃদয়, তেমনি তারই নীচে অন্তর্লীন ছিল পরিণত জীবনের এক বিরাট শক্তি, গভীরতা এবং ঔদার্য্য। ব্র্যাডলে-বার্ট লিখেছেন, '...and it was this happy combination of the grave and gay, of the spontaneity of youth and the wisdom of age, that constituted something of the secret of his wonderful charm".

কলেজের সিলেবাস অনুযায়ী গোল্ডস্মিথের গ্রীস-রোম ও ইংল্যান্ডের ইতিহাস, রাসেলের মডার্ন ইউরোপ, রবার্টসনের চার্লস দ্য ফিফ্‌থ, গে'র ফেবল্‌স, ড্রাইডেন সম্পাদিত ভার্জিলের ঈনীড, পোপ সম্পাদিত হোমারের ইলিয়াড-ওডিসি, মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট এবং শেক্সপীয়ারের একটি ট্র্যাজেডি — এই ছিল ডিরোজিওর পড়ানোর জন্য নির্ধারিত বিষয়। কিন্তু ক্লাসে পড়ানোর

সময় সিলেবাসের এই বাঁধা-ধরা গণ্ডীর মধ্যে ডিরোজিও আবদ্ধ থাকতেন না। তিনি তাঁর ছাত্রদের টেনে নিয়ে যেতেন অগাধ জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে। জ্ঞানজগতের একটার পর একটা রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হত ছাত্রদের কাছে। ছাত্রদের মনে জেগে উঠত হাজারো প্রশ্ন। প্রশ্নের ঢেউ উঠত যেন। সব প্রশ্নের উত্তর যে ডিরোজিও দিতেন তা নয়, ছাত্ররাও উত্তর খুঁজত নিজেদের মত করে। আর এর মধ্য দিয়ে তারা যাত্রা করত সেই অজানা দ্বীপের উদ্দেশে যেখানে সত্য আছে। ডিরোজিওর শিক্ষার অভিনবত্বই ছিল এই, তিনি তাঁর ছাত্রদের মনে সত্যকে জানবার জন্য এক সীমাহীন আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিতে পারতেন। তিনি নিজে বেকনের দার্শনিক প্রত্যয় গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন। ফলে জীবনের উদ্দেশ্য যে জ্ঞানার্জন ও সত্যানুসন্ধান, সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক যে যুক্তি, সবচাইতে সুখানুভূতি চিন্তার অবাধ স্বাধীনতা— নবযুগের এই জীবনবেদ তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছিলেন। সিলেবাসের সংকীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে তিনি তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন বেকন, লক, হিউম, রুশো, ভলতেয়ার, বার্কলে এবং রীডের রচনা। কোন একটা বিষয়ে যত রকমের মতামত থাকতে পারে, সবগুলিই তিনি একে একে উপস্থিত করতেন তাঁদের সামনে। তারপর চলত নিরন্তর কাটা-ছেঁড়া, বিচার-বিশ্লেষণ। এর ফলে তাঁদের অটল বিশ্বাসের স্তম্ভগুলি প্রায়ই নাড়া খেত প্রবলভাবে।

ডিরোজিওর শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং ছাত্রদের উপর তাঁর প্রভাব কি রকম ছিল তা জানা যায় তাঁরই ছাত্রদের মধ্যে অগ্রগণ্য কয়েকজনের স্মৃতিচারণা এবং সমসাময়িক অন্যান্য দুয়েক জনের লেখা থেকে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। এঁরাই সেসময় পরিচিত হয়েছিলেন ইয়ং বেঙ্গল বা ইয়ং ক্যালকাটা বা ডিরোজীয়ান নামে। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন, রসিককৃষ্ণ, হরচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন সিনিয়র ছাত্র ডিরোজিওর সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু তাঁরাও তাঁর ক্লাসে যেতেন এবং পড়ানো শুনতেন। পরবর্তী জীবনে এঁদের অনেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে দিক্‌পাল হয়েছিলেন।

ডিরোজীয়ানদের মধ্যে অন্যতম রাধানাথ শিকদার তাঁদের শিক্ষক সম্পর্কে তাঁর ইংরেজী আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন—

"ডিরোজিও দয়ালু এবং স্নেহপরায়ণ শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাবত্তার অভিমান করিলেও তিনি সুবিদ্বান ছিলেন। তিনি প্রথমত জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য। তাঁহার শিক্ষাগুণে সাহিত্যিক যশের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে এমনভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আজও তাহা আমার সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত এবং আমাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে আমি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। তাঁহার নিকট হইতে এরূপ কতকগুলি উদার ও নীতিমূলক ধারণা লাভ করিয়াছি, যাহা চিরকাল আমার কার্যকে প্রভাবিত করিবে।... নিশ্চিত বলিতে পারি যে, সত্যানুসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা — যাহা সমাজের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে আজ এত অধিক পরিমাণে দেখা যায় — এ সকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই।"

(আর্যদর্শন। কার্তিক, ১৮৯১)

প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর সুবিখ্যাত 'A Biographical Sketch of David Hare' গ্রন্থে লিখেছেন—

"The way he (Derozio) explained through, made it open for his students to become outrightly inspired. Some were charmed with the examples that he cited from the anecdotes of justices; some got infatuated with stories of truthfulness; some others were submerged with the emotions related to patriotism or philanthropy".

অর্থাৎ, কোন একটা বিষয়কে যখন তিনি ব্যাখ্যা করতেন তখন তা অনুপ্রাণিত করত ছাত্রদের। কেউ অনুপ্রাণিত হত তাঁর বলা ন্যায়পরায়ণতার বিভিন্ন কাহিনীগুলি থেকে, কেউ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত তিনি সততা সংক্রান্ত যে গল্পগুলি বলতেন সেগুলি শুনতে শুনতে, আবার কেউ কেউ শিহরিত হত তাঁর উত্তুঙ্গ স্বদেশপ্রেম ও লোকহিতৈষণার বক্তব্যের দ্বারা। বাস্তবিক, ডিরোজিওর শিক্ষা

পাল্টে দিয়েছিল তাঁর ছাত্রদের জীবনবোধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। এ প্রসঙ্গে 'দি ইন্ডিয়া রিভিউ' পত্রিকা তাদের ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় লেখে —

"এই সময় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দর্শন (Metaphysics) আলোচনার ধুম পড়িয়া যায়। কলেজের সরকারী শিক্ষক মিঃ এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি ছাত্রদের মনেও এই বিষয়ে প্রেরণা দিতেন। কৃষ্ণমোহন কলেজে ডিরোজিওর নিকটে কখনও পড়েন নাই, তিনি এই সময়ে কলেজের বাহিরেই ছিলেন। তথাপি তাঁহাকেও ডিরোজিও প্রবর্তিত আলোচনার ছোঁয়া লাগে; এবং তিনি নব্য হিন্দু-সংস্কারক দলে যোগ দিয়া তাঁহাদের আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। এই সকল যুবক আপনাদের সত্যের বন্ধু ও মিথ্যার শত্রু বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহারা দর্শনের আলোচনায় নিবিষ্টচিত্ত হন এবং ঘোষণা করেন তাঁহাদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হিন্দু পৌত্তলিকতার বিলোপসাধন। তাঁহারা নৈতিক আদর্শের উপরই জোর দিতেন।... তাঁহারা সকল প্রকার পাপকর্ম এবং মনুষ্যপ্রকৃতির কলুষিত বাসনাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন।"

বৃহত্তর সমাজে পদার্পন - বিতর্কসভা

এই ধরনের শিক্ষার জন্য সেদিন ক্লাসরুমের বদ্ধ পরিসরটাকে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের কাছেই অপর্যাপ্ত বলে মনে হয়েছিল। ফলে টিফিনের সময়, স্কুল ছুটির পর, এমনকি তার পরেও ডিরোজিওর নিজের বাড়িতে ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর কাব্য, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, সমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অন্তহীন আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব রাখা হল এই সমস্ত আলাপ-আলোচনার বৈঠকগুলিকে একটি স্থায়ী, নির্দিষ্ট রূপ দেওয়ার। জন্ম নিল নবযুগের নব আদর্শচর্চার কেন্দ্র, বিতর্ক সভা (debating club) অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন। অনুমান, ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকেই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দিকে এর অধিবেশন বসত ডিরোজিওর লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতেই। পরে মানিকতলায় হিন্দু কলেজের অন্যতম অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে (পরবর্তীতে ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন) এই সভা স্থানান্তরিত হয়। সভার সভাপতি মনোনীত হন ডিরোজিও। সম্পাদক উমাচরণ বসু। সভার কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতেন ডিরোজিও নিজে। ডিরোজিওর অনুগামী, হিন্দু কলেজের প্রায় সমস্ত সিনিয়র ছাত্রই এই সভার সদস্য ছিলেন।

বাংলার নবজাগরণে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। প্রতিষ্ঠার অল্প সময়ের মধ্যেই এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল মানিকতলার বাগানবাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে বাইরেও। সমাজের গণ্যমান্য অনেক প্রবীণ বিদ্বান ব্যক্তিই এখানে উপস্থিত হতেন তরুণ বক্তাদের আলোচনা শোনার জন্য। ডেভিড হেয়ার নিয়মিত যোগ দিতেন সভার অধিবেশনগুলিতে। আসতেন বিশপস কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মিল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড

রায়ান, বড়লাট বেন্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি কর্ণেল বেনসন, ডবলিউ ডবলিউ বার্ড (পরবর্তীকালে ডেপুটি গভর্ণর) প্রমুখ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিরাও। এঁরা ছাত্রদের আলোচনায় উৎসাহ দিতেন।

কী নিয়ে আলোচনা চলত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভায়? ডিরোজিওর জীবনীকারদের মধ্যে অন্যতম টমাস এডওয়ার্ড লিখেছেন, সত্য, ন্যায়, প্রত্যয়, স্বাধীনচিন্তা, স্বদেশপ্রেম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব থেকে শুরু করে অর্থহীন পৌত্তলিকতা, মানবদ্রোহী জাতপাত, পুরোহিতদের বুজরুকি প্রভৃতি সমস্তই ছিল তাঁদের আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়, যা তাঁদের চিন্তার তলদেশ পর্যন্ত আলোড়িত করত। জীবনীশক্তিতে ভরপুর তরুণ বক্তারা তাঁদের উচ্চকিত বক্তব্যে স্পষ্টতই বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে। ইয়ংবেঙ্গল দলের সাথে ব্যক্তিগতভাবে খুবই ঘনিষ্ঠ রেভারেন্ড লালবিহারী দে লিখেছেন—

> "The general tone of the discussions was a decided revolt against existing religious institutions.... The young lions of the Academy roared out, week after week, 'Down with Hinduism! Down with Orthodoxy'".

শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধেই নয়, সেসময় তরুণ ডিরোজীয়ানরা বিদ্রূপ করতেন খ্রিস্টান মিশনারীদের লোক ঠকানো খ্রিষ্ট ধর্মকেও। এর প্রমাণ পাওয়া যায় পাদরি আলেকজান্ডার ডাফের জবানিতে। ডাফ সাহেব প্রায়ই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভায় উপস্থিত থাকতেন। তিনি লিখেছেন, "এদের মতে খ্রিষ্টধর্ম হল কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এক উন্নততর চেষ্টা মাত্র। তাঁদের চোখে পাদরিরা ছিলেন ধূর্ত দুশমন অথবা অশিক্ষিত গোঁড়ার দল। তাঁরা পাদরিদের 'ইওরোপের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়' বলে ঠাট্টা করতেন।" 'ইন্ডিয়া রিভিউ' পত্রিকায় ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যা থেকে জানা যায় — "বন্ধুদের সঙ্গে কৃষ্ণমোহন কয়েক রাত্রি কলিকাতার বড় বড় রাস্তায় ঘুরিয়া খ্রিস্টান পাদরিদের নানাভাবে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার

প্রয়াস পান।" যদিও পরবর্তীকালে এই কৃষ্ণমোহনই ইয়ংবেঙ্গল দলের আরও দুয়েক জন সদস্যের মতই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। সভায় সমাজ, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি আলোচনা চলত রাজনৈতিক নানা ঘটনাবলী, এমনকি দেশের পরাধীনতা নিয়েও। অবশ্য এইসব 'অনাকাঙ্ক্ষিত' আলোচনা সভার ইংরেজ শ্রোতাদের প্রায়ই যে আতঙ্কিত করে তুলত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা হতবাক হতেন বক্তাদের ক্ষুরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ বিচারবোধ, প্রখর পাণ্ডিত্য এবং বক্তব্যের ওজস্বিতা দেখে।

নিজেদের আদর্শ এবং বক্তব্য প্রচারের উদ্দেশ্যে এরপর অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা 'পার্থিনন' নামে ইংরেজিতে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'পার্থিননে'র আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে 'সমাচার দর্পণ' লেখে—

"সংপ্রতি পার্থিনন নামক ইঙ্গরেজী ভাষায় রচিত এক নূতন সম্বাদপত্র ইন্ডিয়া গেজেট যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা সময়ে ২ মুদ্রিত হইবে, অনুমান প্রতি সপ্তাহে একবার। তৎ সম্পাদক ও লেখক সকলি হিন্দুলোক"। (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০)।

কিন্তু এর দুটি মাত্র সংখ্যাই প্রকাশিত হতে পেরেছিল। কারণ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা দেখেই হিন্দু সমাজপতিরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা তাঁদের অর্থবল ও সামাজিক প্রতিপত্তি খাটিয়ে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। প্রথম সংখ্যার বিষয় ছিল এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্ম ও ইংরেজ গভর্ণমেন্টের ব্যয়বহুল বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা। এর দ্বিতীয় সংখ্যা ছাপা হলেও গোঁড়া রক্ষণশীলদের ষড়যন্ত্রে তা আর গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় নি।

'পার্থিনন' বন্ধ হয়ে যাবার খবরে স্বভাবতই উল্লসিত হয়ে উঠেছিল রক্ষণশীলদের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকা। তারা বিষয়টিকে সনাতন হিন্দু ধর্মের জয় হিসাবে বিজ্ঞাপিত করে। সেই সাথে লেখে—

"...ধর্ম্মসভাজনিত ভয়ে ভীত হইয়া বালকেরা ঐ কাগজ করিতে নিরস্ত হইয়াছে, ইহাতে পার্থননের যেমন উত্থান অমনি পতন হইল"।

কিন্তু 'পার্থিনন'-এর এই অপমৃত্যু তরুণ ডিরোজীয়ানদের সত্যানুসন্ধান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রবল ইচ্ছাকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি।

শিক্ষক ডিরোজিওর খ্যাতি অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল হিন্দু কলেজের বাইরেও। তিনি অচিরেই কলকাতার সমগ্র ছাত্রসমাজের কাছে একটা জীবন্ত প্রেরণা হয়ে দাঁড়ালেন। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুকরণে ছাত্রদের অসংখ্য সভা-সমিতি গড়ে উঠতে শুরু করেছিল অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও। ডিরোজিও সেখানেও আমন্ত্রিত হতেন প্রধান বক্তা হিসাবে। ডেভিড হেয়ার তাঁকে প্রায়ই নিয়ে যেতেন তাঁর পটলডাঙার স্কুলে ছাত্রদের সভায়। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল এবং গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতেও তিনি এই উপলক্ষ্যে যেতেন। বলাবাহুল্য, এইসব সভাগুলিও পরিচালিত হত তাঁরই আদর্শ অনুসারে। এই সময়ের একজন প্রত্যক্ষদর্শী, হিন্দু কলেজের তদানীন্তন কেরাণী হরমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন—

"হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি ও প্রথাগুলি সম্পর্কে খোলাখুলি বিদ্রূপ করা হত এইসব সভায়; এবং উত্তপ্ত বাক্-বিতণ্ডা চলত বিভিন্ন নৈতিক বিষয়ের উপর। হিউমের দার্শনিক মতের প্রতি তাঁদের ছিল উষ্ণ সমর্থন। ...সেখানে হিন্দুধর্মকে অভিযুক্ত করা হত জঘন্য, দূষিত এবং যুক্তিবাদী মানুষের শ্রদ্ধার অযোগ্য একটি বাজে জিনিস হিসাবে। হিন্দুদের অধঃপতিত অবস্থা ছিল বহু বিতর্কসভার বিষয়। এই সব সভায় ঘোষণা করা হত, হিন্দুদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারই তাদের এই অধঃপতিত অবস্থার কারণ; এবং এই সিদ্ধান্তই বক্তারা করত যে, একমাত্র কুসংস্কারমুক্ত উন্নত আধুনিক শিক্ষাই তাদের চিন্তাকে মুক্তি দিতে পারে। নারীদের মানসিক জড়ত্বের সমালোচনা তাঁরা করত অত্যন্ত ঘৃণার সাথে। একটি বেশ বড় রকমের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তাঁরা এই সিদ্ধান্তই করেছিল যে, নারীদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা অবগত হয়েছি, এই আন্দোলনের একজন নেতার স্ত্রী অত্যন্ত মার্জিত রুচির সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্না মহিলা। তিনি মেয়েদের পড়ানোর জন্য অন্যান্য বিষয়ের সাথে দর্শন ও গণিতকেও যুক্ত করেছিলেন।"

(টমাস এডওয়ার্ডের 'Henry Derozio' গ্রন্থে উদ্ধৃত। মূল পুস্তক ইংরেজিতে।)

একদিকে হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর শিক্ষা, অন্যদিকে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভায় বাংলার 'Young Lions'-দের উচ্চকিত সামাজিক

বিদ্রোহ — এ দুয়ের সম্মিলিত অভিঘাতে একটি তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল গোটা হিন্দু সমাজের বুকে। শুধুমাত্র আলাপ-আলোচনা কিংবা বক্তৃতার মধ্যেই ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামীরা সীমাবদ্ধ ছিলেন না। নবযুগের বিপ্লবাত্মক আদর্শকে জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ করার জন্যও তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। জাতপাত, ছোঁয়াছুঁয়ি, খাদ্যাখাদ্যের বিচার বর্জন করেছিলেন তাঁরা। তাঁদের এই বিদ্রোহের উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছিল শহরের অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যেও। বহু ছাত্র অস্বীকৃত হয়েছিল উপনয়নের সময় উপবীত ধারণ করতে। অনেকে উপবীত ছিঁড়েও ফেলেছিলেন। ঠাকুর পুজো, সন্ধ্যা-আহ্নিক ইত্যাদি যুক্তিহীন দেশাচারগুলিকে তাঁরা বিদ্রূপ করতেন খোলাখুলিভাবে। হেয়ারের জীবনীতে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, এই সময় ছেলেদের মধ্যে অনেকেই এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, "তাহাদিগকে বলপূর্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিকের পরিবর্তে হোমারের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।"

সমাজের প্রত্যাঘাত, ডিরোজিও-র প্রত্যুত্তর

উচ্চকিত এই বিদ্রোহের সামাজিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মারাত্মক। একটা 'গেল-গেল' রব উঠে গিয়েছিল চারদিকে। ধর্ম গেল, নীতি গেল, জাত গেল। ঘরে ঘরে প্রবীণ বয়স্কদের সাথে অল্প বয়েসী তরুণদের উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া, অশান্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিত্যদিনের ঘটনা। অভিভাবকেরা আতঙ্কিত হয়ে হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানালেন। কলেজের কুশিক্ষাই যে ছেলেদের এই ধর্মহীন, নীতিহীন আচার-আচরণের কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ সম্ভবতঃ তাঁদের ছিল না। তাঁদের মতে ফিরিঙ্গি ডিরোজিওই ছিলেন যত নষ্টের গোড়া।

ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতেই আরও কিছু ঘটনার আবর্ত সেসময় প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আছড়ে পড়েছিল সমাজের বুকে। রামমোহনের নেতৃত্বে সতীদাহ প্রথাবিরোধী আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর বড়লাট বেন্টিঙ্ক আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করলেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে কলকাতায় সস্ত্রীক এসে পৌঁছলেন পাদরি আলেকজান্ডার ডাফ। তিনি আরেক পাদরি হিলকে সাথে নিয়ে খ্রিস্টধর্মের প্রচার শুরু করলেন হিন্দু কলেজের ঠিক পাশেই। গুজব রটে গেল, কলেজের সমস্ত ছাত্রই নাকি খ্রিস্টান হয়ে যাবে। ফলে ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল হিন্দু সমাজ। পাল্টা আঘাত করতে উদ্যত হয়ে উঠল সেও। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি রাধাকান্ত দেবের অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল 'ধর্মসভা'। প্রতিক্রিয়ার প্রথম সুসংগঠিত রূপ। ধর্মসভার পক্ষ থেকে জাতিচ্যুত করা হল

রামমোহনের অনুগামীদের। রামমোহনকে গুণ্ডা পাঠিয়ে হত্যা করার চেষ্টা পর্যন্ত করা হল। আঘাত এল ডিরোজিওর ওপর।

বহু অভিভাবক তাঁদের ছেলেদের হিন্দু কলেজে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রতিদিন অভিযোগের পাহাড় জমে উঠতে শুরু করেছিল কর্তৃপক্ষের টেবিলে। ডিরোজিও গোটা হিন্দু সমাজের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে নিয়ে কুৎসার বন্যা বইতে লাগল সমাজে। তিনিই তো এই অনাসৃষ্টির মূল! বিদ্রোহী তরুণ দলের নেতা! এই দারুণ অশান্তির নায়ক! সমাজকে যদি আবার স্থিতস্বার্থ ধর্মধ্বজীদের আওতায় নিয়ে আসতে হয় তাহলে এই ধর্মদ্রোহী ফিরিঙ্গিটিরই বলি প্রয়োজন প্রথমে। ফলে অর্থবলে বলীয়ান, সামাজিক প্রতিপত্তির ধারক-বাহক কলেজের পৃষ্ঠপোষক এবং পরিচালকেরা তৎপর হয়ে উঠলেন।

প্রথমে সারকুলার পাঠিয়ে ছাত্রদের সতর্ক করা হল, যাতে তারা কোনরকম সভা-সমিতিতে যোগদান না করে। এরপর ডিরোজিওর বিরুদ্ধে আনা হল তিনটি মারাত্মক রকমের অভিযোগ। অভিযোগগুলি এইরকম—

১. ডিরোজিও নাস্তিকতায় বিশ্বাস করেন।

২. ডিরোজিও পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়াটাকে ছাত্রদের নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করেন না।

৩. ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে এই মত প্রচার করেন যে ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত।

বলাবাহুল্য, এই সমস্ত অভিযোগই ছিল জনশ্রুতিনির্ভর। এর ভয়ংকরতম অভিমুখ ছিল এই দিকেই যে ডিরোজিও হিন্দুসমাজের ভাবাবেগে আঘাত করেছেন।

২৩ এপ্রিল, শনিবার, ১৮৩১। হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যেরা এক জরুরি সভায় মিলিত হয়ে ডিরোজিওকে কলেজ থেকে অপসারিত করাই সিদ্ধান্ত করলেন। কমিটির নয় জন সদস্যের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ডিরোজিওর পাশে থাকলেন মাত্র তিন জন— উইলসন, ডেভিড হেয়ার এবং শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। ২৪ এপ্রিল উইলসন ডিরোজিওকে ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত জানিয়ে

দিলেন এবং অনুরোধ করলেন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে। ২৫ এপ্রিল ডিরোজিও পদত্যাগ করলেন হিন্দু কলেজ থেকে।

উইলসন স্নেহ করতেন ডিরোজিওকে। ডিরোজিওর পদত্যাগ পত্র পাবার পর তিনি তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি সম্পর্কে তাঁকে লিখলেন — "এ সমস্ত নেহাতই গুজব; এবং আমিই সবচেয়ে খুশি হতাম যদি আমি জোর গলায় বলতে পারতাম এসবই মিথ্যা।"

অবশেষে ডিরোজিও তাঁর বিরুদ্ধে আনীত গোঁড়া হিন্দু সমাজনেতাদের অভিযোগগুলির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এখান থেকে নীরবে প্রস্থান করা তাঁর মত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ তরুণের একেবারেই সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ, নিজের আদর্শ ও মত সর্বসমক্ষে তুলে ধরার এটাই ছিল সবচাইতে সুন্দর সুযোগ। তিনি সে সুযোগকে কাজেও লাগালেন অসাধারণ নৈপুণ্যে।

২৬ এপ্রিল, ১৮৩১।

তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগের উত্তরে ডিরোজিও একটি সুদীর্ঘ চিঠি লিখলেন উইলসনকে — যা ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। আধুনিক যুক্তিবাদ এবং চিন্তার স্বাধীনতার উপর এইরকম ওজস্বিতাপূর্ণ সাহিত্য, বাস্তবিক, গোটা উনবিংশ শতাব্দীর কালপর্বে এদেশে খুব বেশি রচিত হয়নি। এই চিঠির ছত্রে ছত্রে সেদিন ফুটে উঠেছিল তাঁর বিদ্রোহী সত্তা, যিনি অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তি এবং সত্যানুসন্ধানকেই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। চিঠিটির কিছু অংশ আমরা এখানে তুলে দিচ্ছি। ডিরোজিও লিখছেন —

"কারও কাছে এমন মতামত আমি কোনদিন প্রকাশ করিনি যাতে আমাকে নাস্তিক মনে করা সম্ভব। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্বন্ধে মন খুলে আলোচনা করা যদি অপরাধ হয়, তাহলে অপরাধী বলে আমি নিজেকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নই। এ বিষয়ে নানামুনির নানামত আছে। সেই মত নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে উন্মুক্ত মনে আলোচনা করেছি। যাঁরা আস্তিক

তাঁদের কথা বলেছি, যাঁরা নাস্তিক তাঁদের কথাও বলেছি, যাঁরা অস্তিনাস্তির প্রশ্নই উত্থাপন করতে চান না তাঁদের কথাও উল্লেখ করতে ভুলিনি। আমি জানি না, এরকম একটি গুরুবিষয় নিয়ে এইভাবে আলোচনা করার মধ্যে অন্যায় কোথায়! একপক্ষের কথা অন্ধের মতন বিশ্বাস করব, অন্যপক্ষের যুক্তি শুনব না বা বিচার-বিবেচনা করব না, এইটাই কি কোনবিষয়ে জ্ঞানলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা? কি করে তাহলে সেই জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করবে? আর বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, তার ভিতটাই বা কি করে দৃঢ় হবে যদি না প্রতিপক্ষের মতামত বিশ্লেষণ করা হয় এবং তার যুক্তি খণ্ডন করার মত ক্ষমতা থাকে?

"... সেই জন্য আমি ছাত্রদের দার্শনিক হিউমের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, কারণ হিউম অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও শাণিত যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন। কেবল তাই করেই আমি ক্ষান্ত হইনি। ডক্টর রীড ও স্টুয়ার্টের প্রতিযুক্তি ও উত্তরও হিউম প্রসঙ্গে তাদের পড়িয়েছি। হিউমের যুক্তির এত জোরাল প্রতিবাদ আজ পর্যন্ত আর কেউ করতে পারেননি। এবং 'This is the head and front of my offending.' ধর্মবিষয়ে ছাত্রদের মজ্জাগত ধ্যানধারণার মূল পর্যন্ত যদি আমার এই শিক্ষার ফলে নড়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার জন্য আমি কি অপরাধী?...

"সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও মনের পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে আমি নিজে এত বেশি সজাগ যে অত্যন্ত ছোটখাট বিষয়েও আমি কখনও একটি নির্দিষ্ট মত প্রকাশ করি না। অনুসন্ধিৎসার অনন্ত সমুদ্রে দুর্জ্ঞেয় সত্যের দ্বীপে যাত্রা করাই জ্ঞানান্বেষণের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে আমার ধারণা।

"...আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা ও তাঁদের আদেশ পালন করা আমি নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি কি না? আপনার এই প্রশ্নে সত্যিই আমি হতবাক হয়ে গেছি। জীবনে কোনদিন কেউ আমাকে এই ধরনের একটা অস্বাভাবিক প্রশ্ন যে করবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।... আমি যদি পিতৃহীন না হতাম তাহলে আমার পিতাই এই অপপ্রচারের উচিত জবাব দিতে পারতেন। এই বলে জবাব দিতেন যে যাঁরা আমার বিরুদ্ধে এই কুৎসিত অভিযোগ করেছেন অথবা অন্য যাঁরা এদিক থেকে নিজেদের মহাত্মা বলে

মনে করেন, তাঁদের কারও চেয়ে আমি কম মাতৃপিতৃভক্ত নই। হয়ত খোঁজ করলে দেখা যাবে, তাঁদের অনেকের চেয়ে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য জীবনে আমি অনেক বেশি পালন করেছি। সুতরাং আমি আমার ছাত্রদের যে এরকম শিক্ষা দিতে পারি না তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।... তবে সমাজে মাতাপিতার অনেক তথাকথিত বাধ্য সন্তানকে দেখেছি কুলাঙ্গারে পরিণত হতে, তাই মধ্যে মধ্যে তাদের সাবধান করে দিয়েছি যে মাতাপিতার প্রতি বাধ্যতার মুখোস পরে অমানুষ হওয়ার চেয়ে কিছুটা অবাধ্য হয়েও মানুষ হওয়া শ্রেয়।...

"আপনার তৃতীয় প্রশ্ন হল, ভাইবোনের বিবাহকে সামাজিক অপরাধ বলে আমি মনে করি কিনা? হ্যাঁ, নিশ্চয় আমি তা অসঙ্গত বলে মনে করি। এরকম একটা আজগুবি বিষয় নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে আমি আলোচনা করতে পারি, একথা আপনারা ভাবলেন কি করে? অবাক হয়ে ভাবি, আমার বিরুদ্ধে এরকম সব বিচিত্র অভিযোগ কোন্ শ্রেণীর উর্বর মস্তিষ্ক থেকে আবিষ্কৃত হতে পারে!... একশ্রেণীর কাপুরুষ চরিত্রহীন লোক আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপপ্রচারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। মিথ্যাই তাদের উপজীব্য। ধর্মবিষয়ে কেউ স্বাধীন চিন্তা করলে তাকে সমাজের লোক নাস্তিক ও নরাধম বলতে পারে, একথা মানি ও বুঝি। কিন্তু অন্য যে সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন সেগুলি যে এইভাবে কোন সভ্যসমাজে কোন সভ্য মানুষের চরিত্রকে কলংকিত করার জন্য উদ্ভাবিত হতে পারে, তা আপনার চিঠিতে না জানলে আমার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব হত না।... গুজব রটনাকারীদের বলবেন, 'I am not a greater monster than most people'.

"...আপনার প্রশ্নের উত্তর এইখানেই শেষ করলাম। এখন আমি আপনাকে সবিনয়ে একটি প্রশ্ন করব। মিথ্যা জনরবের ভয়ে অথবা কুৎসা-প্রচারকদের তোষণের জন্য আমাকে কলেজ থেকে কর্মচ্যুত করা কি আপনাদের মত বিচক্ষণ ব্যক্তিদের পক্ষে সঙ্গত হয়েছে? ...কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যখন মিথ্যা জনরব রটে তখন তারই ভিত্তিতে যদি তাঁকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলে সেটা মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় না কি? কেবল জনরব শান্ত করার জন্য কলেজের অধ্যক্ষরা আমাকে কর্মচ্যুত করতে বাধ্য হয়েছেন, একথা মেনে নিতে আমি

রাজি নই। আগে থেকেই তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন আমাকে তাড়াবার জন্য। অন্ধ ধর্ম-গোঁড়ামিই আমার প্রতি তাঁদের বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলেছে। তা যদি না হত তাহলে এরকম অভিনব কৌশলে, সমস্ত সৌজন্য ও শালীনতাবোধ বিসর্জন দিয়ে, এইভাবে তাঁরা আমাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতেন না।... প্রকাশ্যে এ অবিচারের প্রতিবাদ করতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না, কারণ প্রতিবাদ করলে পরোক্ষে তাঁদের মতামতের মর্যাদা দেওয়া হয়। এটুকু মর্যাদাও তাঁদের প্রাপ্য বলে আমি মনে করি না।" (মূল ইংরেজি চিঠির পূর্ণাঙ্গ বয়ানের জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। বঙ্গানুবাদ বিনয় ঘোষ কৃত।)

কিন্তু প্রতিক্রিয়ার যে ঝড় উঠেছিল সমাজে, হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর অপসারণের সাথে সাথেই তা স্তব্ধ হয়ে গেল না। কারণ তাঁর শিষ্য-অনুগামীরা এরপর আরও অনেক বেশি উৎসাহের সাথে নিয়োজিত হয়েছিলেন নবযুগের আদর্শের বাস্তবায়নে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, কোন কোন মাতাপিতা তাদের প্রিয় সন্তানকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলেন। যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর সুবিখ্যাত 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' গ্রন্থে লিখেছেন —

"তৎকালে বাংলা সংবাদপত্রে বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের মুসলমানের দোকানে রুটি বিস্কুট আহার করা-রূপ গুরুতর অপরাধ নানালঙ্কার সহিত বারম্বার প্রকাশিত হওয়াতে তাহাদের পিতামাতা সভয় হইয়া বালকগণকে প্রহার, কারারুদ্ধ ও বিষভক্ষণ করাইয়া তাহারদিগের প্রাণ পর্যন্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।"

ডিরোজীয়ানদের মধ্যে অন্যতম কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিতাড়িত করা হয়েছিল বাড়ি থেকে, যদিও এর পেছনে যে ঘটনাটি ছিল তার জন্য ব্যক্তিগত-ভাবে কৃষ্ণমোহন কোনমতেই দায়ী ছিলেন না। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ আগস্ট মধ্যকলকাতায় গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে কৃষ্ণমোহনের পৈতৃক বাড়িতে। কৃষ্ণমোহন সেদিন বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরই বন্ধু-বান্ধবেরা এদিন তাঁর বৈঠকখানার ঘরে বসে হিন্দুদের গোঁড়ামি ও অজ্ঞতার

বিরুদ্ধে নানারকম উত্তেজক আলাপ-আলোচনায় মেতে ওঠে এবং সেই সাথে মুসলমানের দোকান থেকে কিনে আনা রুটি গোমাংস সহযোগে ভক্ষণ করতে থাকে পরম উল্লাসে। এরপর তারা ভুক্তাবশিষ্ট মাংসের হাড়গুলি ছুঁড়ে দেয় প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে এবং চিৎকার করে ওঠে— 'ওই গো-হাড়! ওই গো-হাড়'! এতে স্বভাবতঃই প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ওঠে ঐ প্রতিবেশী ব্রাহ্মণসহ পাড়ার সমস্ত লোকেরা। তারা সম্মিলিতভাবে অর্বাচীনদের প্রহার করতে উদ্যত হয়। কিন্তু কৃষ্ণমোহনের বন্ধুরা দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। এরপর প্রতিবেশীদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে কৃষ্ণমোহনের উপর, যদিও ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। ক্ষিপ্ত প্রতিবেশীরা তাঁর দাদা ভুবনমোহনের কাছে দাবী জানাতে থাকে, এরপর কৃষ্ণমোহনকে আর বাড়িতে ঠাঁই দেওয়া চলবে না। ফলে কৃষ্ণমোহন বাড়ি ফিরে সমস্ত শুনে আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হলেও তাঁকে সেই দিনই বিদেয় করে দেওয়া হয় বাড়ি থেকে। পরিস্থিতি চারদিকে এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে সেদিন নিরাশ্রয় কৃষ্ণমোহনকে আশ্রয় দেবার জন্য শহরের কোন হিন্দুই এগিয়ে আসার সাহস পান নি, একমাত্র প্রিয় বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন ছাড়া। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জনের বাড়িতেও খুব বেশী দিন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। এইসময় তাঁকে রাস্তা-ঘাটে প্রহার করা, এমনকি হত্যা করার চেষ্টা পর্যন্ত হয়েছিল। অবশেষে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি চৌরঙ্গিতে এক সাহেবের বাড়িতে অতিথি হিসাবে আশ্রয় পান।

স্বভাবের দিক থেকে কৃষ্ণমোহন ছিলেন ব্যঙ্গপ্রবণ। হিন্দুদের কুসংস্কার নিয়ে বিদ্রূপাত্মক ঠাট্টা-তামাশা করতে তিনি ভালোবাসতেন। এই সময় 'Persecuted' নামে যে নাটকটি তিনি রচনা করেন তা ছিল তদানীন্তন সামাজিক পরিস্থিতির বিচারে এক কথায় বিস্ফোরক। এ সম্পর্কে 'সমাচার দর্পণ' তাঁদের ৩ ডিসেম্বর ১৮৩১ তারিখের সংখ্যায় লেখে—

"...বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যের স্থানে আমরা 'তাড়িত' (Persecuted) নামক এক নাটক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলাম। ঐ গ্রন্থ তিনি অতি নৈপুণ্যরূপে রচনা করিয়াছেন। ...কিন্তু কলিকাতাস্থ লোকেরা এইক্ষণে যে প্রকার দলাদলে বিভক্ত আছেন তদ্দৃষ্টে ঐ পুস্তকের মর্ম্ম প্রকাশ করা আমাদের (পক্ষে) সুকঠিন"।

এই নাটকে কৃষ্ণমোহন ধনবান হিন্দুদের 'সনাতন' হিন্দু ধর্মের ছাতার তলায় থেকে অনৈতিক জীবন-যাপন ও অর্থহীন জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে নির্মম কশাঘাত করেছিলেন।

ডিরোজীয়ানদের মধ্যে অগ্রগণ্য আরেকজন, রসিককৃষ্ণ মল্লিকও বাধ্য হয়েছিলেন গৃহত্যাগ করতে। গুজব রটে গিয়েছিল, রসিককৃষ্ণ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করতে চলেছেন। এতে ভীত, সন্ত্রস্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে নেশার বস্তু খাইয়ে শেকল বেঁধে কাশীতে প্রেরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সারারাত্রি অচেতন অবস্থায় থাকার পর পরদিন সকালে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি শৃঙ্খলিত অবস্থা থেকে নিজেকে কোনমতে মুক্ত করেন এবং চিরকালের জন্য বেরিয়ে আসেন বাড়ি ছেড়ে। স্বভাবতই, আজন্ম পরিচিত পরিবারের প্রিয় সংস্পর্শ থেকে এভাবে দূরে চলে যাওয়ার মানসিক যন্ত্রণা ছিল নিদারুণ। কিন্তু সত্যের জন্য, আদর্শের জন্য তরুণ ডিরোজীয়ানরা সেদিন এই যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। যে মায়ের স্তন্যে, যে পিতার স্নেহে শিশুকালে তাঁরা লালিত-পালিত হয়েছিলেন সেই মাতা-পিতাই অন্ধ ধর্ম-মোহে নিষ্ঠুরতম আঘাত করার জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তাঁদের বিরুদ্ধে। সামাজিক নির্যাতন এমন মাত্রায় পৌঁছেছিল যে সত্যানুসন্ধানী তরুণ বিদ্রোহীরা তাঁদের নবপ্রকাশিত 'Enquirer' পত্রিকায় (প্রথম প্রকাশ ১৭ মে ১৮৩১) লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন —

"Persecution is high for we have deserted the shrine of Hinduism. The bigots are violent because we obey not the calls of superstition. Our conscience is satisfied, we are right; we must persevere in our career. If opposition is violent and insurmountable, let us rather aspire to martyrdom than desert a single inch of the ground we have possessed".

অর্থাৎ, "আমাদের উপর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন নামিয়ে আনা হয়েছে, কারণ আমরা হিন্দুত্বের পবিত্র মন্দির ত্যাগ করেছি। ধর্মান্ধরা উন্মত্ত, কারণ আমরা তাদের মত কুসংস্কারের আবেদনে সাড়া দিইনি। কিন্তু আমাদের বিবেক পরিতৃপ্ত,

কারণ আমাদের পথই ন্যায়সঙ্গত পথ। আমরা এপথে আরও এগিয়ে যাব। বিরুদ্ধ শক্তি যদি আরও উন্মত্ত হয়ে ওঠে, আমাদের উপর আক্রমণে যদি তারা আরও অদম্য হয়, আমরা বরং শহীদের মৃত্যুবরণ করব, কিন্তু কিছুতেই আমাদের অর্জিত উপলব্ধি ও বিশ্বাসের এক ইঞ্চিও আমরা বর্জন করব না।"

কিন্তু প্রশ্ন, ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের উপর গোটা হিন্দু সমাজের এত আক্রোশের কারণ কি? এর কারণ ছিল ফরাসি বিপ্লব ও প্রথম যুগের পাশ্চাত্য রেনেসাঁ প্রাণিত তাঁদের আদর্শের বিপ্লবাত্মক মেজাজ সহ্য করার মত পরিস্থিতি তখন হিন্দু সমাজের ছিল না। তাই তাঁদের কালাপাহাড়ী কাণ্ডকারখানায় ধর্মধ্বজীদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছিল। যদিও একথাও ঠিক, আদর্শকে জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ করতে গিয়ে বহুক্ষেত্রেই সংযম ও ধৈর্যের অভাব ঘটেছিল তাঁদের। তাঁদের মধ্যে বৃহত্তর সমাজের প্রতি মর্যাদা ও আস্থার অভাব ফুটে উঠেছিল। উগ্রতা এবং আবেগের আতিশয্য অনেক সময়ই তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন এই দেশ ও দেশের ধর্মান্ধ মানুষেরা তাঁদের শত্রু নয়। ঔদ্ধত্যপূর্ণ আঘাত করে মানুষকে বড় করা যায় না। অথচ আসল কাজ হল, অন্ধতামুক্ত বড় মানুষ গড়ে তোলা। ফলে প্রচলিত সমাজ ও ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করার দুর্দমনীয় নেশায় প্রকাশ্যে সুরাপান, গোমাংস ভক্ষণ, কিংবা প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের বাড়িতে গো-হাড় নিক্ষেপের মত এমন কিছু কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছিল তাঁদের দ্বারা, যা অনেক সময় তাঁদের মূল উদ্দেশ্যকেই বানচাল করে দিয়েছে; যার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া ঝড়ের মত ধেয়ে এসেছে তাঁদের দিকে এবং সবচেয়ে বেশী আঘাত করেছে তাকেই যে তাঁদের নেতা, বন্ধু এবং শিক্ষাগুরু। অথচ বাস্তব হল, তাঁরই শিষ্যদের এহেন উগ্র কার্যকলাপ ডিরোজিওর অভিপ্রেত ছিল না। এদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্থবির জনচৈতন্যের ঝুঁটি ধরে তিনি নাড়া দিতে চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু আদর্শকে পালন করতে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবনাচরণে অসংযম এবং ধৈর্য্যচ্যুতি তিনিও বরদাস্ত করতে পারেননি। উইলসনকে লেখা তাঁর দীর্ঘ ঐতিহাসিক চিঠিটিতে এর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু তবু তাঁকেই অপরাধী বানানো হল। এটা স্পষ্ট, একটা সময় ডিরোজীয়ানদের

অসংযত কিছু কার্যকলাপের ফলে উদ্ভূত সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ ডিরোজিওর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আর ছিল না। এর কারণ হয়ত তাঁর বয়সের নিতান্তই অল্পতা। বৃহত্তর জনগণকে সমাজ পরিবর্তনের শক্তি হিসাবে গণ্য না করা। হয়ত এইরকম একটা সার্বিক চিন্তাবিপ্লবকে সুনির্দিষ্ট এবং সুসংগত কোন পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত উপযুক্ত অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা তাঁর ছিল না। কিন্তু কারণ যাই হোক, এর ফলে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল তাঁরই জীবন। তাঁর সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি এইখানেই।

কিন্তু তিনি কি ব্যর্থ হয়েছিলেন? ইতিহাসের দরবারে এ প্রশ্ন আজও অনেকেরই মনে জাগে। এর সুস্পষ্ট উত্তর, না। উইলসনকে একদিন তিনি লিখেছিলেন— "এদেশের একদল তরুণের শিক্ষার খানিকটা দায়িত্ব কিছুদিনের জন্য বহন করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তাদের একদল গোঁড়া আপ্তবাক্যবাদী অন্ধবিশ্বাসী তৈরি না করে সত্যিকার সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ তৈরি করব।" তাঁর এই উদ্দেশ্য হয়ত ব্যর্থ হয়নি একেবারে। আর কিছু না হোক, সেটা সবার চেয়ে বড়, সেই সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, প্রখর স্বদেশপ্রেম এবং চিন্তার স্বাধীনতা তিনি সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছিলেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে। উত্তরকালে তাঁর এইসব ছাত্রদের প্রাত্যহিক জীবনাচরণে অননুকরণীয় সততা, সুগভীর কর্তব্যবোধ, উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্র এবং এদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা, নারীর কল্যাণ, রাজনৈতিক চেতনা তথা জাতীয়তাবাদের উন্মেষে অবিস্মরণীয় অবদান ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা হয়েছে। ডিরোজিওর সময়কার হিন্দু কলেজের কেরাণী হরমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন —

"তাঁর শিক্ষার শক্তি এমন ছিল যে কলেজের বাইরে এইসব ছাত্রদের নৈতিক আচরণ ছিল আদর্শস্বরূপ। তাঁরা বাইরের পৃথিবীর প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এই প্রশংসা শুধুমাত্র এই কারণেই ছিলনা যে তাঁরা ছিলেন সাহিত্য কিংবা বিজ্ঞানের অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছাত্র, এটা এজন্যও ছিল যে, তাঁদের সকলকেই মনে করা হত একেক জন সত্যনিষ্ঠ মানুষ (**Men of truth**)। প্রকৃতপক্ষে, সততা এবং হিন্দু কলেজের ছাত্র — এই দুটি কথা সেসময়

সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশের মানুষের মধ্যে একটা সাধারণ বিশ্বাসই গড়ে উঠেছিল যে, ছেলেটি যেহেতু হিন্দু কলেজের ছাত্র সেহেতু সে কোন মিথ্যাই বলতে পারে না। যাঁরা সে সময়ের কথা এখনও মনে করতে পারেন তাঁরা এর সত্যতা স্বীকার করবেন।"

ফলে অজস্র দুঃখ এবং অপমানের মধ্যেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একটা পরিতৃপ্তি ডিরোজিওর হয়ত ছিল। তিনি ব্যর্থ জীবন যাপন করেননি। তাঁরই ছাত্রদের উদ্দেশে নিবেদিত তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'Sonnet to the Pupils of the Hindu College' — এ তাই হয়ত তিনি লিখেছিলেন —

"What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity,
Weaving the chaplets you have yet to gain,
Ah then I feel I have not lived in vain".

একটি মহৎ জীবনের অকাল পরিসমাপ্তি

হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগের পর শিক্ষকতা করার আর কোন ইচ্ছা ডিরোজিওর সম্ভবত ছিল না। তিনি কবি ও সাংবাদিকের স্বাধীন জীবন বেছে নিলেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ১ জুন নিজস্ব সম্পাদনা ও মালিকানাধীনে প্রকাশ করলেন 'The East Indian' নামক একটি দৈনিক পত্রিকা। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি লিখলেন—

"To prevent any misconception to which the name of the paper may give rise the proprietor begs to state that his journal will not be exclusively devoted to any particular interest, but that it will advocate the just rights of all classes..."

যাঁরা মনে করেন 'ইস্ট ইন্ডিয়ান' ছিল কেবলমাত্র ইউরেশিয়ানদেরই পত্রিকা, ডিরোজিওর এই বক্তব্যে তাঁদের ভ্রান্তি নিরসন হবে। যদিও একথাও ঠিক, ইউরেশিয়ানদের সমানাধিকারের দাবিতে তিনি যেভাবে সেদিন একাকী লড়াই করেছিলেন তারও কোন তুলনা ছিল না। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছিলেন—"I love my country and I love justice, and therefore, I ought to be here".

'ইস্ট ইণ্ডিয়ান'-এর পাশাপাশি ডিরোজিও লিখে চলছিলেন 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'এনকোয়ারার' ইত্যাদি সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকাগুলিতেও। কিন্তু একদিন সমস্তই স্তব্ধ হয়ে গেল যখন ১৮৩১-এর ১৯ ডিসেম্বর তিনি কলেরায় আক্রান্ত

হলেন। এরপর আর মাত্র সাতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন। এই সময় তাঁর শিষ্যরা প্রাণপণে তাঁর সেবা করতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন উইলসন, গ্রান্ট, হেয়ার প্রমুখ তাঁর গুণমুগ্ধরা। অবশেষে ২৬ ডিসেম্বর মাত্র বাইশ বছর আট মাস বয়সে জীবনদীপ নিভে গেল তাঁর।

শোনা যায়, মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় পাদরী হিল তাঁর কাছ থেকে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে খ্রিস্টান বলে স্বীকার করেননি। প্রিয় অনুগামী মহেশচন্দ্র ঘোষকে (ইনি ডিরোজিওর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর পাশে ছিলেন) তিনি এবিষয়ে বলেছিলেন, "ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে চূড়ান্ত সত্য কি তা আজও আমি জানি না। আমার অনুসন্ধান শেষ হয়নি এখনও।" তিনি হয়ত এভাবেই ধর্মের প্রতি যেকোন রকমের মোহকে আমৃত্যু দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন।

লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ি থেকে অল্প দূরে পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল ডিরোজিওকে। সুপ্রাচীন সেই গোরস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেই সমাধিস্থল আজও আছে। সম্প্রতি নতুন সাদা রঙ করা হয়েছে তার উপর। কিন্তু কোন স্তম্ভ নেই। কোন মন্দির নির্মিত হয় নি তার উপর। নির্জন, নিঃসঙ্গ শুধু একটি সমাধি বেদী। তার গায়ে উৎকীর্ণ তাঁরই রচিত কয়েকটি স্তবক—

Here all is silence, let him sleep his sleep,
No dream shall flit into that slumber deep —
No wandering mortal thither once shall wend,
There, nothing o'er him but the heavens shall weep,
There, never pilgrim at his shrine shall bend,
But holy stars alone their nightly vigils keep.

দেশাত্মবোধে অনন্য কবি, ইতিহাসে উপেক্ষিত

একথা হয়ত ঠিক যে এদেশে নবজাগরণের নির্মাণে শিক্ষক ডিরোজিও কবি ডিরোজিওকে অনেকখানি ছাপিয়ে গেছে। কিন্তু তার মানে এই নয়, ডিরোজিওর কবিকৃতি স্বল্প আলোচনার দাবি রাখে। ডিরোজিওর জীবনদর্শন ও তাঁর মানস-প্রতীতির সম্যক উপলব্ধিতে তাঁর রচনারও তন্নিষ্ঠ পাঠক আমাদের হতে হবে। কারণ যে 'ট্রুথ' ও 'রিজন'-এর সাধনা তিনি জীবনব্যাপী করেছিলেন, তাঁর কাব্য ছিল তারই রসঘন প্রতিভাস। সেখানে তিনি তাঁর ভাবনা-ধারণার প্রত্যেকটিই ব্যক্ত করেছিলেন সোচ্চারে। জীবনের উত্থান-পতন, আনন্দ-নিরাশা, প্রেম ও ঘৃণার বিষাদ-মধুর চিত্র এঁকেছিলেন অসাধারণ কলানৈপুণ্যে। সেখানে বিধৃত তাঁর অফুরন্ত জীবনাবেগ ও দাসত্ববিরোধী চেতনার এক অনন্য মিশেল।

ডিরোজিওর কবিতায় তাঁর ব্যক্তিসত্তা উপস্থিত ভীষণভাবেই। বস্তুত, অমিত সম্ভাবনা এবং অতলান্ত নৈরাশ্যের দোলাচলে ব্যক্তির যে স্বতন্ত্রতাবাদী কণ্ঠস্বর মানবতাবাদী রোমান্টিক যুগচেতনার লক্ষণ, তা-ই মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর কাব্যে। তাঁর কাব্য তাঁর জীবন থেকে আলাদা কিছুই ছিল না। কোন সত্য অভিজ্ঞতার অনটন পরিলক্ষিত হয় না সেখানে। তার একদিকে যেমন আমরা পাই কবির একটা উচ্ছ্বসিত, সম্বুদ্ধ হৃদয়, তেমনি একই সাথে আস্বাদন করি তাঁর আপীড়িত হৃদয়ের বিষাদ-মলিন এক অন্তর্লীন আবেগও। বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারণকল্পে আইন চালু করলে তিনি যেমন উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে ওঠেন —

The storm is passing,
and the Rainbow's span

Stretcheth from North to
South : the ebon car
Of darkness rolls away...

সেই তিনিই অনাত্মীয় এক পৃথিবীর নির্মম আচরণে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ে বলে ওঠেন —

Man and misfortune are twin-born — I feel
This to be true, at least 'twas so with me!

বলাবাহুল্য, কাব্যনির্মাণে নবযুগের নবচেতনাসমৃদ্ধ ভাববস্তুর এমনতরো শৈল্পিক উত্তরণ সেদিন ভারতীয় সাহিত্যের কম বড় প্রাপ্তি ছিল না। অথচ কতই বা ছিল কবির বয়স! ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে।

ড্রামণ্ডের স্কুলেই ছাত্রাবস্থায় চৌদ্দ বছর বয়সে জীবনের প্রথম কবিতাটি তিনি রচনা করেছিলেন। সেটি ছিল এই উপমহাদেশে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহিত্যের সর্বপ্রথম নিদর্শনও। তারপর ভাগলপুরের নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর কবিসত্তাটিকে আরও অনেক বিকশিত করে। যদিও বছর খানেকের বেশি ভাগলপুরে তিনি ছিলেন না। তাঁকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল; এবং ইতিমধ্যেই ডক্টর গ্রান্ট হয়ে উঠেছিলেন তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। হিন্দু কলেজে সাহিত্য এবং ইতিহাসের শিক্ষক হিসাবে যোগ দেওয়ার পর কাব্যচর্চার অবসর তিনি খুব অল্পই পেতেন। তবু সারাদিনের খাঁটুনির ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু সময় তিনি ব্যয় করতেন লেখালেখিতে তারই ফসল ছিল ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্য সংকলন 'Poems'. এই সংকলনের মুখবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "Born, and educated in India, and at the age of eighteen, he (the poet) ventures to present himself as a candidate for poetic fame; and begs leave to premise, that only a few hours gained from laborious daily occupations have been devoted to these poetical efforts".

'Poetic fame' বা কবিখ্যাতি ডিরোজিওর কিছুটা হলেও জুটেছিল। কারণ 'Poems' সে সময় রীতিমত প্রশংসা কুড়িয়েছিল কলকাতার সাহিত্যরসিক মহলে। এরপর ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'ফকির অফ জঙ্গীরা' কবি হিসাবে তাঁকে আরও অনেক বেশি প্রসিদ্ধি এনে দেয়। শোনা যায়, কবিখ্যাতি জুটবার পর ডিরোজিও নাকি আচারে-ব্যবহারে বেশ খানিকটা অহংকারী ও উদ্ধত হয়ে উঠেছিলেন। নিজেকে তিনি মনে করতেন একটি ক্ষণজন্মা প্রতিভা। একবার তাঁর কোন এক বন্ধু তাঁর কবিতার বিরূপ সমালোচনা করায় তিনি নাকি চিরদিনের জন্য সেই বন্ধুর সাথে সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন। কিন্তু এসমস্তই নিতান্তই কোন নিন্দুকের রটনা না হলেও এতে ডিরোজিওর দোষের হয়ত খুব একটা কিছু ছিল না। কারণ জগতের অনেক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জাতকবিই ডিরোজিওর আগে ও পরে এইরকম আত্মশ্লাঘা দোষে দুষ্ট ছিলেন। যেমন হাফেজ বলতেন, তাঁর কবিতা এত মধুর যে তা শুনে আকাশমণ্ডল সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর উপর মুক্তাবর্ষণ করছে। বায়রণ তাঁর হাবে-ভাবে অন্যদের বুঝিয়ে দিতে চাইতেন তিনি হচ্ছেন সেই ধরনের ভদ্রলোক যিনি অনায়াসেই লিখতে পারেন। আর আমাদের মধু কবি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রুফ দেখতে দেখতেই বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে বলে উঠেছিলেন, "My dear Raj, this will surely make me immortal".

সাধারণ পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি পরিবারে জন্মেও ডিরোজিও এই দেশকে জীবন দিয়ে ভালবেসেছিলেন। এটা একটা নিছক ঘটনা মাত্র ছিল না। এদেশে জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে এর তাৎপর্য ছিল সীমাহীন। কারণ ডিরোজিও তাঁর এই স্বদেশপ্রেমের আকুতিকে তাঁর কাব্যে ও সাহিত্যে সার্থকভাবে বাণীরূপ দিতে পেরেছিলেন। ডিরোজিওই এদেশের প্রথম কবি যিনি সর্বপ্রথম স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'The Harp of India' (মার্চ, ১৮২৭-এ রচিত) এবং 'To India - My Native Land' কবিতা দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরাধীন মাতৃভূমির জন্য কবির নিগূঢ় বেদনাবোধ এই কবিতা দুটির পরতে পরতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

এদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার রূপকার হয়েও ডিরোজিও কখনওই এদেশের মাটি থেকে তাঁর পা তুলে নেন নি। এদেশের আবহমানকালের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে তাঁর ছিল প্রাণের যোগ। তাই গভীর বেদনার সাথে তিনি বার বার স্মরণ করেছেন এদেশের অতীত গৌরবকে। তাঁর বহু কবিতাতেই এর নজির পাওয়া যাবে। 'To India - My Native Land' কবিতায় তিনি তাই লিখেছিলেন—

My country! in thy day of glory past
A beautious halo circled round thy brow;
And worshipped as a deity thou wast.
Where is that glory, where that reverence now?

ডিরোজিওর এই অতীত কাতরতা ছিল তাঁর সুগভীর দেশাত্মবোধেরই পরিচায়ক।

সংসারে চাইবার মত ডিরোজিওর আর সম্ভবত কিছুই ছিল না, শুধুমাত্র একটি জিনিস ছাড়া। আর সেটা হল এই, তিনি তাঁর এই উপেক্ষিতা মাতৃভূমির সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন নিঃশেষে। চেয়েছিলেন তার একটুখানি শুভাশীর্বাদ। তাই পূর্বোক্ত ওই কবিতাটিতেই তিনি বলে উঠেছিলেন —

And let the guerdon of my labour be
My fallen country !
one kind wish from thee !

'The Harp of India' কবিতাতেও তাঁর হৃদয়ের এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। এই কবিতার একটি অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তি—

Harp of my country, let me strike the strain !

'হে আমার স্বদেশবীণা! তোমার ওই ছিন্ন তারে আমায়. আবার নতুন করে সুর বাঁধতে দাও।'

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, স্বদেশপ্রেমের আধারে রচিত 'To India-My Native Land' নামক অনবদ্য সনেটটি ডিরোজিও ব্যবহার করেছিলেন তাঁর 'ফকির অফ জঙ্গীরা' কাব্যের মুখবন্ধরূপে। পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ কৃত কবিতাটির বঙ্গানুবাদ ছিল এইরকম—

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী!
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে!
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এইমাত্র পুরস্কার গণি;
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননী।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষকে স্বদেশ হিসাবে বন্দনা করে ডিরোজিও এইসব কবিতা রচনা করছেন এমন একটা সময়ে যখন এদেশে জাতীয়তাবাদী কোন চেতনা কিংবা আন্দোলন সেভাবে গড়েই ওঠে নি। এমনকি দেশ যে পরাধীন এই বোধটাই তখন সমাজে ছিল প্রায় অনুপস্থিত। ফলে সেদিক থেকে এদেশের প্রথম দেশপ্রেমিক কবির স্বীকৃতি ডিরোজিও অনায়াসেই দাবি করতে পারেন। আর শুধুমাত্র এই কারণেও ভারতীয় সাহিত্য তাঁর কাছে অনেক পরিমাণে ঋণী।

ফকির অফ জঙ্গীরা

ডিরোজিওর স্বদেশচেতনার বলিষ্ঠতম প্রকাশ দেখা যায় তাঁর 'ফকির অফ জঙ্গীরা' কাব্যে। এখানে তাঁর নিসর্গপ্রেম, মানবমুক্তির আকুতি, অন্ধ সংস্কারবিরোধিতা, এদেশের নারীদের জন্য বেদনাবোধ, সর্বোপরি, সমস্ত রকম ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে মানবিক প্রেমের বিঘোষণা তাঁর এই প্রখর স্বদেশচেতনার জারকরসে সিঞ্চিত হয়ে ধরা দিয়েছে। এই কাব্যের রসদ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ভাগলপুরের নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সেখানকার প্রচলিত একটি লোককথা থেকে। এর আখ্যানভাগটি ছিল সংক্ষেপে এইরকম :

উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়ে নলিনী ভালবাসত একটি মুসলিম যুবককে। কিন্তু একদিন নলিনীর বিয়ে হয় তারই সম্প্রদায়ের অন্য আরেকজনের সাথে। হতাশায়, দুঃখে, ক্ষোভে মুসলিম যুবকটি বেছে নেয় দুর্বৃত্তের জীবন। কালক্রমে ভয়ংকর এক দস্যুদলের সর্দার হয়ে ওঠে সে। এদিকে খুব অল্পকালের মধ্যেই নলিনীর স্বামীর মৃত্যু হয়। মৃত স্বামীর চিতায় সহমৃতা হওয়ার জন্য নলিনীকে নিয়ে আসা হয় শ্মশানে। সেখানে তার আচ্ছন্ন মানসলোকে শুরু হয় এক তীব্র দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব একদিকে তার বেঁচে থাকার প্রবল আকুতি এবং অন্যদিকে সমাজের নিষ্কম্প কঠোর অনুশাসন — এ দুয়ের মধ্যে। শাস্ত্রের রক্ষকেরা স্বর্গের প্রলোভন দেখিয়ে অবিশ্রাম মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে নলিনীর কানে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটিয়ে দেশাচারের অমোঘ আকর্ষণে মন্ত্রমুগ্ধ নলিনী তার মৃত স্বামীর চিতায় উঠে বসে। আর ঠিক তখনই ঘটে একটি অভাবনীয় ঘটনা। নলিনীর প্রথম জীবনের প্রেমিক সেই মুসলমান যুবক তার

সঙ্গীসাথীদের নিয়ে অতর্কিতে হানা দিয়ে সহমরণের বীভৎস পরিণতি থেকে উদ্ধার করে নলিনীকে। এরপর সে তাকে নিয়ে আসে তার নিজের আস্তানায়। গঙ্গার ধারে সুউচ্চ খাড়া পাথুরে টিলার উপর সেই আস্তানা। এই টিলাটিরই নাম জঙ্গীরা। সেখানে তারা উভয়েই নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় বর্জন করে মিলিত হয় পরস্পরের সাথে। রচিত হয় সমস্ত রকম সংকীর্ণতার উর্ধ্বে মানবপ্রেমের এক অপূর্ব সুষমা। কিন্তু এই ঘটনা ক্রোধে উন্মত্ত করে তোলে নলিনীর ধর্মান্ধ পিতাকে। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সে রাজমহলের অধিপতি শাহ্ সুজার সাহায্য প্রার্থনা করে। শাহ্ সুজা সম্মত হয়। এরপর ভালবাসায় উন্মুখ ধর্মত্যাগী দুটি নর-নারীকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য নলিনীর পিতা শাহ্ সুজার সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে জঙ্গীরাকে। দু'পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। শেষে দেখা যায় নলিনী ও তার প্রেমিক সেই মুসলিম যুবকের মৃতদেহ পাশাপাশি পড়ে আছে রণক্ষেত্রে।

'ফকির অফ জঙ্গীরা' ডিরোজিওর ব্যালাডধর্মী কাব্য। এর কাহিনী দুটি সর্গে বিভক্ত। ব্যালাডধর্মী এই কাব্যরচনার অনুপ্রেরণা তিনি সম্ভবত সমসাময়িক ইংরেজ কবি স্কট ও বায়রণের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এর অভিনবত্ব ছিল এর বিষয়বস্তু, এবং যে আদর্শ ও মূল্যবোধের রূপরেখা তিনি এতে অঙ্কন করেছিলেন তার অন্তর্নিহিত বিপ্লবাত্মক প্রণোদনা। বাস্তবিক, তৎকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কাব্যে এইরকম একটি কাহিনীর অবতারণা ছিল অভূতপূর্ব ঘটনা। দুঃসাহসিকতারও পরিচায়ক বটে। কাব্যের অন্তর্গত এই কাহিনী নির্মাণে ডিরোজিও সেদিন জীবন ও জগত সম্পর্কে অধীত তাঁর বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। এখানে নায়িকা হিন্দু। নায়ক মুসলিম। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এই দুটি নর-নারীর ভালোবাসার এক করুণ কাহিনীর মধ্য দিয়ে ডিরোজিও এখানে দেখিয়েছিলেন ধর্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ একটি গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের নির্মম কদর্য চিত্র, যা আজও আমাদের চৈতন্যের তলদেশ পর্যন্ত আলোড়িত করে প্রবলভাবে। কাব্যের কোথাও মুসলিম যুবকটির কোন নাম বা অন্য কোন পরিচয় উল্লিখিত না হলেও তাঁর ধর্মীয় পরিচয়

পরিস্ফুট হয় তারই মুখে উচ্চারিত কিছু পঙ্‌ক্তি থেকে, যখন সহমরণের নারকীয় পরিণতি থেকে নিজের প্রেমাস্পদাকে উদ্ধার করার পর সে বলে ওঠে—

No more to Mecca's hallowed shrine
Shall wafted be a prayer of mine;
No more shall dusky twilight's ear
From me a cry complaining hear;
Henceforth I turn my willing knee
From Alla, Prophet, heaven, to thee!

প্রকৃতপক্ষে এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কাব্যের নায়ক নিজেকে তার সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্মের ঘেরাটোপ থেকেই মুক্ত করে; এবং তার আত্মা প্রতিষ্ঠিত হয় জাত-পাত-সম্প্রদায়ের অতীত মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার এক মহিমময় রাজ্যে। সেখানে তার আল্লা, অবতার, বেহেশ্‌ত, মক্কা, কোনকিছুরই প্রয়োজন নেই। সেখানে মানুষই সব— এই সত্যের উপর তার জীবন প্রতিষ্ঠিত। তার এই আদর্শই দর্শনের ভাষায় সেকুলার মানবতাবাদ। ডিরোজিওর আগে আর কোন ভারতীয় কবি নবযুগের এই সেকুলার আদর্শকে কাব্যে রূপ দিতে পারেন নি।

'ফকির অফ জঙ্গীরা' কাব্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সতীদাহের মত গোঁড়া হিন্দুদের একটি অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে ডিরোজিওর জোরালো প্রতিবাদ। কাব্যের প্রথম সর্গে আমরা দেখি শ্মশানে মৃত স্বামীর চিতায় উঠবার পূর্বমুহূর্তে অসহায় নলিনীর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে —

O ! this is but the world's unfeeling way
To goad the victim that it soon will slay,
And like a demon 'tis its custom still
To laugh at sorrow, and then coldly kill.

বলাবাহুল্য, এর ফলে কাব্যটি সেসময় একটা বাড়তি মাত্রা পেয়ে গিয়েছিল। কারণ ডিরোজিও যখন 'ফকির অফ জঙ্গীরা' রচনা করছেন সেসময় এদেশে

রামমোহনের নেতৃত্বে সতীদাহবিরোধী আন্দোলনও তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এর কিছুদিন পরেই ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারণ আইন প্রণয়ন করেন।

সতীদাহ নিবারণকল্পে বেন্টিঙ্কের আইন প্রণয়নকে স্বাগত জানিয়েও ডিরোজিও সেসময় একটি কবিতা রচনা করেছিলেন — 'On the Abolition of Sattee'. এই কবিতায় তিনি সেদিন তীব্র উল্লাসে বলে উঠেছিলেন—

The priestly tyrant's cruel charm is broken,
And to his den alarmed the monster creeps;

বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন —

Bentinck, be thine the everlasting mead !

লিখেছিলেন —

He is the friend of man
who breaks the seal
The despot custom sets
in deed and thought,
He labours generously
for human weal
Who holds the Omnipotence
of fear as nought;

শেষে বলেছিলেন —

The storm is passing, and
the Rainbow's span
Stretcheth from North to Sourth :
the ebon car
Of darkness rolls away :
the breezes fan
The infant dawn, and

morning's herald star
Comes trembling into day :
O ! can the sun be far?

নতুন সূর্যোদয়ের এই কল্পনাতেই ডিরোজিও আমৃত্যু বিভোর ছিলেন।

সুগভীর দেশাত্মবোধ, অন্ধ সংস্কারবিরোধিতা এবং জাত-পাত-সম্প্রদায়-বিরোধী মানব প্রেমের পরিস্ফুটনে 'ফকির অফ জঙ্গীরা' সেদিন ভারতীয় সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিল তার বহুমাত্রিক মৌলিকতা নিয়ে। যদিও আশ্চর্যের বিষয় এই, সেদিন তাঁর কবিতার সমালোচকেরা অনেকেই তাঁর কাব্যচিন্তার এই মৌলিকত্বকে স্বীকার করেননি। তাঁদের চোখে ব্যালাডধর্মী এই কাব্য রচনায় ডিরোজিওর উপর স্কট, বায়রণ প্রমুখ সমসাময়িক ইংরেজ কবিদের প্রভাবটাই বড় বেশি করে চোখে পড়েছে। ফলে তাঁরা অন্যায়ভাবেই ডিরোজিওকে সেদিন অভিযুক্ত করেছিলেন অনুকরণের অভিযোগে। তাঁর কাব্যের প্রাপ্য মর্যাদা তাঁকে তাঁরা দেন নি। বয়সের হিসাব কষে যাঁরা তাঁর কাব্যশক্তির প্রশংসাও করেছিলেন তাঁদের মূল্যায়নও সঠিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলেই মনে হয়। অথচ বাস্তব হল, স্কট, বায়রণ, মূর কিংবা ক্যাম্পবেলের মত কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও ডিরোজিও তাঁর কবিতায় সেদিন এমন একটি মাত্রা যোগ করেছিলেন যা ছিল তাঁরই নিজস্ব। অনাবশ্যক শব্দবাহুল্য কিংবা অলঙ্কারের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ হয়ত তাঁর কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেছিল অনেক সময়। কিন্তু Poetic diction-এর ক্ষেত্রে তাঁর তরুণ বয়সের এই ত্রুটির দিকটাকে স্বীকার করে নিয়েও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, সেদিন তিনি তাঁর কল্পনা ও মননশীলতার মৌলিকতায় এই উপমহাদেশে স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতা, মানবমুক্তি এবং অন্ধসংস্কার বিরোধিতার মত এমন বহু বিষয় তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, যা ছিল বাস্তবিকই অভিনব! বিস্ময়করও বটে!

এ প্রসঙ্গে ডিরোজিওর জীবিতাবস্থায় ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে Oriental Herald পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কবিতাবলীর একটি দীর্ঘ সমালোচনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। সমালোচনাটি ওই বছরেরই ২৩ নভেম্বর

Calcutta Gazette পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। এতে সমালোচক জনৈক পত্রলেখকের একটি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করেছিলেন যা ছিল এইরকম —

"You know this country, will be able duly to appreciate the difficulties against which he (Derozio) has had to contend. The total absence of almost all objects of natural beauty; the still more complete want of all noble and exalted feelings amongst those with whom the poet must have associated; the very language, which can hardly be called English, that they speak; taking all these things into fair consideration, which you are well able to do from actual experience, we cannot but admit that production of such a poem as the 'Fakeer of Jungheera' is very extraordinary".

পত্রলেখকের বক্তব্য যথার্থ ছিল বইকি! তাই সমালোচক নিজেও যোগ করেছিলেন —

"Taken as a whole, it is true, his poetry is marked by great faults and blemishes, but he is, nevertheless, a poet; and with better models in his eye than those on which he has obviously formed himself, he may, we conceive, one day produce something which neither India nor England 'would willingly let die'..."

কিন্তু এরপরই সমালোচক অপরাধীর কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছিলেন ডিরোজিওকে। কারণ ডিরোজিওর কবিতায় বায়রণ, মূর, স্যান্ডার্স — বিশেষ করে বায়রণের প্রভাব তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন নি। শুধুমাত্র এই কারণেই 'ফকির অফ জঙ্গীরা' তাঁর কাছে মনে হয়েছিল একটি ব্যর্থ সৃষ্টি — "not at all to our liking". তিনি লিখেছিলেন, "It is altogether upon the strained and extravagant model of Lord Byron's

poetic romances of love and murder; and too like the exaggerated imitations of the worst Byronic style, with which we have been overflowed in this country, even to nausea..."

বায়রণের ভূত একটি কচি ভারতীয় ছেলের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে বলে সমালোচক বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, বোঝা যায়। কিন্তু তিনি ধরতেই পারেন নি 'ফকির অফ জঙ্গীরা' নিছক 'poetic romances of love and murder' ছিল না। এই কাব্যের অন্তর্নিহিত বার্তাটি রয়ে গিয়েছিল তাঁর দৃষ্টির অন্তরালেই। তিনি শুধু দেখেছিলেন 'exaggerated imitation of the worst Byronic style'. নবযুগের কবির চিন্তার মৌলিকত্বটুকু চোখে পড়েনি তাঁর।

এই সমালোচনা পড়ার পর ডিরোজিওর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আমরা জানি না। কারণ সমালোচক শেষ পর্যন্ত 'প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ' উপদেশকের পর্যায়ে নেমে এসেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

"Let him lay Moore and Byron on the shelf, ...read Shakespear, Milton, Spencer, the old dramatists and Robert Burns; study earnestly condensation in style, and above all, stick to Truth and Nature in word and thought..."

বলাবাহুল্য, এই 'জ্ঞানগর্ভ' উপদেশাবলী বর্জন করলেও ডিরোজিওর খুব একটা ক্ষতি হয়ত হত না।

কিন্তু তাঁর কবিতা সম্পর্কে সমালোচকদের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরবর্তী সময়েও খুব একটা পরিবর্তন হয়েছিল কি? বোধহয় না। কারণ পরবর্তীকালেও যাঁরা এমনকি ডিরোজিওর কাব্য সংকলন নতুনভাবে সম্পাদিত করে প্রকাশও করেছিলেন তাঁদেরও ডিরোজিওর কবিসত্তার মূল্যায়নে সামগ্রিকতার ঘাটতি ছিল যথেষ্ট। এঁদের অনেকের কাছেই ডিরোজিও ছিলেন শুধুমাত্র একজন 'ইউরেশিয়ান কবি।' ব্র্যাডলে-বার্ট তাঁর 'The Harp of India' কবিতাটিকে দেখেছিলেন ইউরেশিয়ানদের 'দুঃখ এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন' হিসাবে। এমনকি বিনয় ঘোষ পর্যন্ত ডিরোজিওর কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় এক জায়গায় লিখেছিলেন, "কিন্তু অনুভূতির সঙ্গে অভিজ্ঞতার এমন সংমিশ্রণ ডিরোজিওর

জীবনের স্বল্প পরিসরে সম্ভব হয়নি যাতে তাঁর প্রত্যয় ও কল্পনায় মৌলিকতার স্বাক্ষর ফুটে উঠতে পারে। বস্তুতঃ সেরকম স্বাক্ষর তাঁর কবিতায় বিশেষ নেই।" যদিও তিনি একথাও বলেছিলেন, "...সব ত্রুটি ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও, যেটুকু সম্মান ও স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে তিনি দাবি করতে পারেন তা হল— নবযুগের নবচেতনার প্রথম ভারতীয় কবির সম্মান। ডিরোজিওর আগে আর কোন ভারত সন্তান, মাতৃভাষায় বা ইংরেজী ভাষায়, নবযুগের কল্পনা ও চিন্তা কাব্যে প্রকাশ করেছেন কিনা জানিনা। যদি অন্য কেউ তা করে থাকেন (১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের আগে) তাহলেও নবযুগের প্রথম পর্বের কবিদের মধ্যে আমাদের দেশে ডিরোজিও অগ্রগণ্য বলে স্বীকৃত হবেন।"

ফ্রিডম ও অনার : ডিরোজিওর দুই ধ্রুবতারা

'Freedom' এবং 'Honour' — এই দুটি শব্দকে ডিরোজিও তাঁর কাব্যে খুব বড় জায়গা দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ এই দুটি শব্দই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয়। তাঁর বহু কবিতায় এর নজির ছড়িয়ে আছে। 'Freedom to the Slave' (ক্রীতদাসের মুক্তি) তাঁর এরকমই একটি কবিতা। কবিতাটি 'Poems' কাব্য সংকলনের অন্তর্ভুক্ত; এবং এটি তিনি রচনা করেছিলেন ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, মাত্র আঠারো বছর বয়সে।

দাসব্যবসার মত একটি মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথা কলকাতায় চালু ছিল ডিরোজিওর সময়কালেও। কলকাতা ছিল সেসময় দাস কেনাবেচার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। গবাদি পশুর মত নৌকায় বা জাহাজে দাসদের বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসা হত এখানে কিংবা এখান থেকে চালান যেত অন্যত্র। আর এতে সায় ছিল খোদ গভর্ণর জেনারেল থেকে শুরু করে কোম্পানির উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরও। কারণ এদের প্রত্যেকেরই জীবনযাত্রা ছিল মধ্যযুগীয় নবাব-বাদশাহদের মতই। শোনা যায়, ডিরোজিওর অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগের সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক হিকি তাঁর বাড়িতে ষাটজন গোলাম পুষতেন। কারও কারও ক্ষেত্রে সংখ্যাটা একশোও পেরিয়ে যেত। যদিও তা নিয়ে উচ্চবাচ্য ছিল না কারও। গোলামির বেড়ি পায়ে পরানোর জন্য এইসব হতভাগ্য ছেলেমেয়েদের চুরি করে নিয়ে আসা হত তাদের বাপমায়েদের কাছ থেকে। অনেকে নিদারুণ অন্নাভাবে নিজেরাই বিক্রি করে দিত ছেলেমেয়েদের। ধর্মীয় অনুশাসন মেনেও সন্তানকে পরিত্যাগ করত অনেকে। তারপর এইসব গোলামদের জীবনে নেমে আসত নরকের অন্ধকার।

মনিবরা অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাতেন এদের উপর। অনেকে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যেত মাঝে মাঝে। ডিরোজিও আবাল্য এই ক্রীতদাসপ্রথার আবহেই জীবন কাটিয়েছিলেন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন ক্রীতদাসদের বন্দী জীবনের যন্ত্রণা। তাঁর চিরস্বাধীন মন বিদ্রোহ করে উঠত এই কুৎসিত দাসত্বের বিরুদ্ধে। 'Freedom to the Slave' তাঁর সেই দাসত্ববিরোধী চেতনারই ফসল। এদেশে আর কেউ সেসময় ক্রীতদাসদের বন্দীজীবনের অনুষঙ্গে মানবমুক্তির আর্তিকে এভাবে তাঁদের সাহিত্যের উপজীব্য করে তোলেন নি। এই কবিতা রচনার প্রায় ষোল বছর পর ক্রীতদাসপ্রথা নিষিদ্ধ হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে; এবং যেটা আরও কৌতূহলোদ্দীপক তা হল এই, ক্রীতদাসদের জীবন নিয়ে রচিত বিশ্বের সাড়া জাগানো উপন্যাস মিসেস স্টো'র 'Uncle Tom's Cabin' রচিত হয় এর পঁচিশ বছর পর। আজকের যুগের তরুণ প্রজন্মের কথা বিবেচনা করে কবিতাটির পুরোটাই এখানে উদ্ধৃত করা হল। সেই সাথে যুক্ত করা হল তার একটি সংক্ষিপ্ত সারানুবাদও। কবিতার শুরুতেই ডিরোজিও উদ্ধৃত করেছিলেন ক্যাম্পবেলের সেই বিখ্যাত উক্তি— "And as the slave departs, the man returns".

How felt he when he first was told
A slave he ceased to be;
How proudly beat his heart, when first
He knew that he was free !—
The noblest feelings of the soul
To glow at once began;
He knelt no more; his thoughts were raised;
He felt himself a man.
He looked above — the breath of heaven
Around him freshly blow;
He smiled exultingly to see
The wild birds as they flew,
He looked upon the running stream
That 'neath him rolled away;

Then thought on winds, and birds, and floods,
And cried, 'I'm free as they!'
Oh Freedom ! there is something dear
E'en in thy very name,
That lights the altar of the soul
With everlasting flame.
Success attend the patriot sword,
That is unsheathed for thee !
And glory to the breast that bleeds,
Bleeds nobly to be free !
Blest be the generous hand that breaks
The chain a tyrant gave,
And feeling for degraded man,
Gives freedom to the slave.

অর্থাৎ, ডিরোজিও এখানে বলতে চেয়েছেন, কী অনির্বচনীয় আনন্দেই না পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সেই মানুষটির হৃদয় যখন সে প্রথম জানতে পারল সে আর ক্রীতদাস নয়। তার চিন্তা ও অনুভূতিগুলো সেই মুহূর্তেই মহৎ আবেগের ছোঁয়ায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে এই প্রথম অনুভব করল, সে মানুষ। আর কখনও কারও সামনে তাকে নতজানু হতে হবে না। সে আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল — মুক্ত বাতাস আলিঙ্গন করল তাকে। বুনো পাখিদের ডানা মেলে উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে সে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল অনবরুদ্ধ নদীস্রোতের দিকে। তারপর চিৎকার করে বলে উঠল, 'আমিও ওদের মত মুক্ত। আমিও স্বাধীন ওদের মত।' স্বাধীনতা! তোমার চেয়ে প্রিয় পৃথিবীতে আর কী আছে? তোমার অনির্বাণ দীপশিখার আলোকেই আলোকিত হয়ে ওঠে এই হৃদয়। তোমারই জন্য নিষ্কাশিত হয় দেশপ্রেমীর খর তরবারি। আর সাফল্য চুম্বন করে তাকে। স্বাধীনতার জন্য যে বুক থেকে রক্ত ঝরে পড়ে, তা না জানি কত মহৎ! যে হাত অত্যাচারীর শৃঙ্খল চূর্ণ করে দাসত্বপীড়িত মানুষের জীবনে এনে দেয় মুক্তির স্বাদ, সেই হাতই তো ধন্য!

স্বাধীনতার জন্য ডিরোজিওর এই যে তীব্র আকুতি, এই যে তাঁর দাসত্বমুক্তির কামনা, এর উৎস কোথায়? এর উৎস নবযুগের সেই বশ্যতাবিরোধী সত্তা যা স্বাধীনতাকে ব্যক্তির জন্মগত অধিকার হিসাবে স্বীকার করে, যা অন্যায়তাড়িত অন্ধ সামন্তী শক্তির বিরুদ্ধে মানবাধিকারের দাবীতে লড়ে, যা মানুষকে দাসত্ব থেকে টেনে তুলে বসিয়ে দেয় মর্যাদার সিংহাসনে। এর উৎস প্রথম যুগের সেই বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদ যার ঘোষণায় সব মানুষই সমান। এর উৎস সেই সত্য, ডিরোজিও যার অনুসারী। ডিরোজিওর কাছে স্বাধীনতাই সত্য, সত্যই স্বাধীনতা। 'Freedom to the Slave' সেই সত্য, সেই স্বাধীনতারই জয়গান। নিপুণ ছন্দের অনুষঙ্গে ভাববস্তুর এমন ব্যঞ্জনাময় বিস্তার ডিরোজিওর অনন্যসাধারণ কবিশক্তিরই পরিচায়ক। মনে হয়, শুধুমাত্র এই একটি কবিতার জন্যই তিনি ভারতীয় সাহিত্যে অক্ষয় আসনের দাবি করতে পারতেন। শুধুমাত্র এই একটি কবিতার জন্যই তিনি আজও আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক। আমাদের সংগ্রামে, আমাদের চেতনায়, আমাদের বিপ্লবে আমরা আজও অস্বীকার করতে পারি না তাঁকে। তাঁর কাছে ঋণ আমাদের অনেক। নবযুগের নবচেতনালব্ধ দাসত্ব মুক্তির এই সুর এদেশে প্রথম কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনিই। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। স্বদেশপ্রেমের প্রথম উদ্‌গাতার মত এক্ষেত্রেও তিনি পাইয়োনীয়ার।

ডিরোজিওর দাসত্ব-মুক্তির এই চেতনা তাঁর বহু কবিতায় ইতিহাসের অনুষঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। ইতিহাস এক্ষেত্রে কাজ করে গেছে প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসাবে। ডিরোজিওর কবিসত্তার এই ইতিহাস চেতনার দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'Thermopylae' কবিতাটি খুবই উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি বলছেন —

Is there none to say, 'Twas well'?
Shall not Fame their story tell,
Why they fought, and why they fell?
'Twas to be free !

বায়রণ কিংবা সমসাময়িক অন্যান্য রোমাণ্টিক ইংরেজ কবিদের মতই প্রাচীন গ্রীস স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক ছিল ডিরোজিওর কাছে। পরাধীনতা ও দাসত্বের কবল

থেকে মানবমুক্তির সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস ডিরোজিও তাঁর কবিতার উপজীব্য করে তুলেছিলেন, এ তাঁর কোন নিছক অতীত বিলাসিতা ছিল না। স্পার্টার বীরদের দাসত্ববিরোধী সংগ্রামে তিনি আসলে দেখতে পেয়েছিলেন তাঁরই চির-বিদ্রোহী, মুক্তিকামী হৃদয়ের প্রতিফলন, যেখানে মৃত্যুও তুচ্ছ স্বাধীনতার বিচারে। স্বাধীনতার জন্য যার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছে, সে লড়ে এবং মরে, কিন্তু পরাভব স্বীকার করে না। ডিরোজিও ইতিহাসের এই অমোঘ শিক্ষাই সোচ্চারে ব্যক্ত করেছিলেন 'Thermopylae' তে।

How Liberty in death is won,
What deeds with Freedom's
sword are done
In freemen's hands !

মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও এই যে মুক্তিকামী সৈনিকদের দাঁতে-দাঁত চাপা লড়াই, এর রহস্য কি? এই রহস্য হল—

They scorned to breathe the breath of slave,
They fought for free and hallowed graves;

ফলে তাঁদের মর্যাদা এবং তাঁদের বিবেকই তাঁদের ডেকে নিয়ে যায় এই লড়াইয়ে। তাঁরা মরেন। কিন্তু বিবর্ণ হন না তারপরও।

Those who armed at Honour's call :
Fell they not as heroes fall —
For liberty?

'Greece' কবিতাতেও ডিরোজিওর শৃঙ্খলমুক্তির এই আকুতি একইরকমভাবে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে।

Chains ! O ! the very thought was death,
A thought they could not bear ;
Their lofty spirits were as free
As their own mountain air !

অর্থাৎ, যাদের মন মুক্তির সংগীতে ভরপুর, শৃঙ্খল শব্দটাই তাদের কাছে অসহ্য। কারণ শৃঙ্খল মৃত্যুর সমান।

গ্রীস ছাড়াও সেসময় ফ্রান্সের পটভূমিকাতেও ডিরোজিও বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করেছিলেন। 'All is lost, save Honour' এরকমই একটি কবিতা। পাভিয়ার যুদ্ধে স্পেনের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পর ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের মাকে লেখা সেই ঐতিহাসিক চিঠি — "মা, আমি আজ সম্মান ছাড়া আর সবকিছুই হারিয়েছি" — তারই সূত্র ধরে ডিরোজিও রচনা করেছিলেন এই কবিতাটি। পড়তে পড়তে মনে হয়, রাজা ফ্রান্সিসের কাহিনীর মোড়কে এ যেন আমরা ডিরোজিওরই জীবনের কাহিনী পড়ছি।

My path of life an adverse fiend
In evil hour, hath crost,
My sceptre from my hand is riven,
Save Honour, all is lost !

ডিরোজিওর বাস্তব জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি, অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েও, যখন তাঁকে ঘিরে কুৎসার বন্যা বয়ে গেছে সমাজে, যখন অত্যন্ত অন্যায়ভাবে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে হিন্দু কলেজ থেকে, তখনও তিনি তাঁর সুগভীর আত্মসম্মানবোধ এক মুহূর্তের জন্যও বিসর্জন দেননি। কারণ তিনি জানতেন, মানুষের আর সব কিছু গেলেও চলে, কিন্তু মানুষ হিসাবে তার মর্যাদাবোধ গেলে কিছুতেই চলে না। কারণ এই মর্যাদার প্রেরণাতেই সমস্ত পরাজয়ের মাঝেও একদিন সে আবার উঠে দাঁড়ায়। বস্তুত, নিজের জীবনের এই গভীর বাস্তব উপলব্ধিই ডিরোজিও মূর্ত করেছিলেন কবিতাটিতে। তাই কবিতার শেষে তিনি বলেন —

But, cheer thee up my drooping heart,
Though by misfortune crost;
Hope still shall light thee on to fame,
For honour is not lost !

সৃষ্টিমুখর সত্যসন্ধান, একাকীত্ব ডিরোজিওর জীবনবোধ

যৌবনের ধর্মে অভিষিক্ত ডিরোজিওর কবিতা। সেই যৌবন কখনও যেমন সৃষ্টি-ভাঙনের খেলায় মত্ত, আবার কখনও তারই ওপর এসে পড়ে বিষাদের করুণ মধুর ছায়া। ডিরোজিওর কাছে 'Poetry' — 'sweet madness'. যৌবনোদ্দীপ্ত মন যখন আকাঙ্ক্ষিত সেই মধুর খ্যাপামিতে ভরপুর হয়ে ওঠে তখনই জন্ম নেয় কবিতা। সৃষ্টির আবেগে ঝংকৃত হয়ে ওঠে হৃদয়ের প্রত্যেকটি তন্ত্রী। তখন সেই মুখরিত কবিচিত্ত জগত সংসারকে তোলপাড় করে বেড়ায়।

It raving reels, to very rapture pleased, —
And then through all creation wildly roves :
(Poetry)

সমুদ্রের সুগভীর নির্জনতা, উত্তুঙ্গ হিমালয়, আরবের সুবাসিত তীর কিংবা ধ্রুপদী গ্রীস অথবা অনবদ্য ইতালির ঝরণা — সমস্তই পর্যটন করে সে। কখনও বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সুন্দরের ঠোঁটের দিকে, কখনও বন্দনা করে বীরের। জীবনের পাত্র উজাড় করে ঢেলে দেয় ভালবাসার সুধারস। আবার কখনও বাতাসে জাগিয়ে তোলে অগ্নিবীণার সুর।

কিন্তু এই-ই বোধহয় সবটা নয়। কারণ Poetry ডিরোজিওর কাছে রণক্লান্ত এক নিষ্ফল জীবনের বেদনাবিধুর আশ্রয়ও। মানবতাবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তিকে সমাজের মধ্যে লীন করতে পারে না। তাই ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তির সামাজিক সত্তার দ্বন্দ্ব ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত তৃপ্তির অভাবজনিত ব্যথায়

বিধুর করে মাঝে মাঝে। তখন মনে হয় জীবন তো শুধু আলোর প্রকাশ নয়। অন্ধকারের সাথেও তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এবং এই আলো-অন্ধকারের সহাবস্থানই মানুষের নিয়তি।

It is ordained by fate,
Life's light and shadow
ne'er must separate;
(Fakeer of Jungheera)

আর তাই বোধহয়, ডিরোজিওকে বার বার মুখোমুখি হতে হয় সেই নির্জন একাকীত্বের; যেখানে সমস্তই শূন্য, সমস্তই নিরানন্দ। বাস্তবিক, ডিরোজিওর কবিতার নিবিড় পাঠে একটা অন্তর্লীন বিষাদের সুর পাঠকের নজর এড়ায় না। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী মানবতাবাদের এই সীমাবদ্ধতার ছায়া থেকে বিপ্লবী কবি শেলিও মুক্তি পাননি। তাঁর মূল চিন্তার সঙ্গে ব্যতিক্রমীভাবে তিনি লেখেন 'স্ট্যানজাজ রিটন ইন ডিজেকশন বাই দ্য বে অব নেপলস'। এমন অনেক কবিতা ডিরোজিও রচনা করেছেন যেখানে তাঁর অন্তরের নিগূঢ় বেদনাজনিত ক্লান্ত হতাশ্বাস স্পষ্ট করে ধরা পড়েছে। জীবন তখন আশাহীন এক চেষ্টার সংগীত — 'Like hope still distant, and like hope still sweet'. সেখানে মানুষ নিজেই নিজেকে প্রতারিত করে। চোখের জলে সে রচনা করে স্বপ্নসৌধ। কিন্তু সেই নির্মাণ প্রতিকূল সমাজ পরিবেশে ভেঙে পড়ে পর মুহূর্তেই। সে জানে—

The blights of earth, the agonies of woe —
The killing poison creeping
through each vein,

কিন্তু তারপরও আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হয় না তার। সে কেবলই আশা করে চলে, আর ব্যর্থতার পলি স্তূপীকৃত হয় তার জীবনের পরতে পরতে। একসময় মনে হয়, জীবনের এই এতসব জাঁক, এত আড়ম্বর, এত অহংকার — এসবই

অর্থহীন। কারণ শেষ পর্যন্ত মানুষ এক মুঠো ধুলো বই তো আর কিছুই নয়। 'Dust' কবিতায় ডিরোজিও তখন লেখেন —

Man is a noble work, the wise man says,
And so said I; but Julian stopped, and took
Some dust up in his hand,
and bade me look
Upon it well, and then he cried,
See, this is man !

আঠারো বছর বয়সী এক কবির জীবনের এই নির্বেদ রীতিমতো বিস্ময়কর!

যে বংশ পরিচয় নিয়ে ডিরোজিও এদেশে জন্মেছিলেন তার কঠোর নিয়তি তাঁকে বার বার আঘাত করেছে। তারপর পরবর্তীকালেও, কর্মক্ষেত্রে, জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে সর্বস্বান্তই হয়েছিলেন তিনি। শোনা যায়, ভাগলপুরে থাকার সময়ে লেসি নামে একটি মেয়ের সাথে সম্পর্ক হয়েছিল তাঁর। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে পরিণতি লাভ করেনি তা-ও। এই ঘটনা চিরদিনের জন্য ছাপ ফেলে গিয়েছিল তাঁর মনে। তিনি আশৈশব প্রত্যক্ষ করেছিলেন একটা ঈর্ষাদীর্ণ, অন্ধ পৃথিবী। তার কাঠিন্য, তার মিথ্যা, তার শৃঙ্খল নিয়ত বিদ্ধ করেছিল তাঁকে। তাঁর মনে হয়েছিল, এই জীবনযন্ত্রণাই বোধহয় কবির একমাত্র নিয়তি। তাই তিনি বলে উঠেছিলেন —

The poet's doom
O ! say not that his doom is bright —
His heart's a taper in a tomb
Flinging around sepulchral light.

বলে উঠেছিলেন —

Alas ! we live in iron days
When lips are sparing even of praise;

যদিও আশ্চর্যের বিষয় এই, জীবনের এই তীব্র আশ্লেষ, এই সুগভীর নৈরাশ্য তাঁকে কখনওই কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার মুখাপেক্ষী করে তোলেনি। Escapist করে তোলেনি। তাঁর কাব্য এবং তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় চমৎকারিত্ব বোধহয় এইখানেই। ক্লান্ত বিষণ্ণতার সুর বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর কাব্যে। কিন্তু বিষাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যে সংগ্রামোদ্দীপ্ত চেতনা অহর্নিশ জাগরূক ছিল তাঁর চিন্তায় এবং মননে, শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে তা-ই। সম্ভবতঃ শেলির মতই ডিরোজিও জীবন ও জগতকে দেখেছিলেন Good এবং Evil-এর এক নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বের প্রকাশরূপেই। হয়ত তিনিও বিশ্বাস করতেন সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে চলে আসা এই ভালো-মন্দ, সাদা-কালো, প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে শেষ বিচারে পরাস্ত হবে মানুষের সেই অশুভ শক্তিই, যা জীবনকে ক্লান্ত করে, বিধ্বস্ত করে। ডিরোজিওর কাছে ধ্বংসই জীবনের একমাত্র সত্য নয়। তার চেয়েও বড় সত্য পৃথিবীতে আছে। কারণ ধ্বংসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নতুন সৃষ্টির বীজ। তিনি জানেন, সমাজ ও সংসারের অশুভ অন্ধকার শক্তি জীবনের সৃষ্টিশীল আনন্দকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু তিনি এও জানেন, একমাত্র মানুষের আত্মসত্তার প্রবল অভ্যুত্থানই চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে সেই অন্ধকার শক্তিকে।

বেদনার ভারে জর্জরিত হৃদয় যখন কোন সান্ত্বনা খুঁজে পায়নি মাটির পৃথিবীতে, ডিরোজিও তখন মৃত্যুকে কামনা করেছেন।

> Death ! my best friend,
> if thou dost ope the door,
> The gloomy entrance to a sunnier world,

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর চির বিদ্রোহী অন্তরাত্মা গর্জন করে উঠেছে —

> But man's eternal energies can make
> An atmosphere around him, and so take
> Good out of evil,...

বলে উঠেছেন —

> O tyrant Fate ! thus shall I vanquish thee,
> For out of suffering shall I gather pleasure.

মৃত্যুকে এভাবে আবাহন করেও শেষ পর্যন্ত এই যে তাঁর বশ্যতাবিরোধী সংগ্রামী চেতনার উত্তরণ, এই উত্তরণই তাঁর কাব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট তাঁর জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও। দুঃখ-যন্ত্রণাময় প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতা, সর্বোপরি ভাগ্যের কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণকে তিনি কোনদিনই মেনে নিতে পারেননি। আবার, যন্ত্রণার অবসানকল্পে আবাহন করেননি কোন ঐশী শক্তির হস্তক্ষেপকেও। বস্তুতঃ তাঁর কাব্যে সেরকম কোন ইঙ্গিত নেই। এ প্রসঙ্গে তাঁর দুটি খুবই উল্লেখযোগ্য কবিতার আলোচনা এখানে না করলেই নয়। একটি 'Morning after a Storm' এবং অন্যটি 'Independence'. প্রথম কবিতাটি ডিরোজিওর কাব্য সংকলন 'Poems'-এর অন্তর্গত, এবং দ্বিতীয় কবিতাটি ডিরোজিওর মৃত্যুর বহু বছর পরে, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, টমাস এডওয়ার্ড রচিত 'Henry Derozio' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। দুটি কবিতাতেই ডিরোজিওর সুগভীর জীবনবাদী প্রত্যয় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'Morning after a Storm' ডিরোজিওর জীবন ও জগত সম্পর্কে এক প্রগাঢ় উপলব্ধিরই ফসল। এর বিন্যাস দুটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম অংশে আমরা দেখি, কবি বিরাট এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর তার ধ্বংসচিহ্ন সমূহের মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি অনুভব করছেন প্রকৃতির তাণ্ডব শক্তি। তাঁর চোখের সামনে পড়ে রয়েছে ঝড়ের দাপটে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া একটি কুঁড়ে ঘর। চারপাশে ছড়ানো ছিটানো ভূপতিত মহীরূহসমূহের অজস্র ডালপালা। আর তখনও আকাশে থরে থরে জমে আছে কালো মেঘ, যেন কোন এক দুঃস্বপ্নের ভয়ঙ্কর সব প্রেতমূর্তি। কিন্তু যখন আকাশে সূর্য উঠল, স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল দিনের আলো, কবি দেখলেন, সেই সমস্ত প্রেতের মত মেঘেরা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। এরপর কবিতার দ্বিতীয় অংশে কবি হঠাৎ করেই উপলব্ধি করলেন প্রকৃতির এক অমোঘ সত্য। তিনি আবিষ্কার করলেন, প্রকৃতির

ওই ধ্বংসলীলার মধ্যেই বাস্তবে লুকিয়ে রয়েছে নতুন সৃষ্টির বীজ। গভীর আবেগে তাঁর সম্বুদ্ধ হৃদয় তখন বলে উঠল —

Oh ! there
I learned a moral lesson, which I'll store
Within my bosom's deepest, inmost core!

'Independence' কবিতাটিতে ডিরোজিওর দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় ব্যক্তিসত্তার উত্তরণের আবেগ আরও অনেক বেশি তীব্রভাবে উপস্থিত। এই কবিতায় তিনি নিজেকে তুলনা করেছেন বাত্যাতাড়িত একটি ক্ষুদ্র দীপশিখার সাথে। ক্ষুদ্র সেই দীপশিখা নিয়োজিত তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে। কিন্তু 'নির্যাতক' ঝোড়ো বাতাস শেষ পর্যন্ত তাকে নির্বাপিত করে। এরপর ডিরোজিও নিজেকে প্রশ্ন করেছেন, তিনিও সেই একই পরিণতি নীরবে মেনে নেবেন কি? এর উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন কবিতার শেষ চরণে, যেখানে তিনি বলে উঠেছেন, — 'Away ! it cannot be'.

বস্তুত, 'Independence' কবিতাটি যেন ডিরোজিওর বাস্তব জীবনেরই প্রতিধ্বনি। হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসাবে তাঁকে কেন্দ্র করেও একসময় প্রতিক্রিয়ার প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে সমাজে। সেই ঝড় পিষে মেরে ফেলতে চেয়েছে তাঁকে। কিন্তু তিনি পরাভব স্বীকার করেননি। তাঁর দুর্বিনীত আত্মা সমাজের সেই অন্ধশক্তির বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠেছে — 'Away! it cannot be'.

ডিরোজিওর জীবনবাদী এই প্রত্যয় জোরালোভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর স্বল্পপ্রচারিত অথচ খুবই উল্লেখযোগ্য একটি নাট্যকাব্য 'A Dramatic Sketch'-এও। এর বিষয়বস্তুটি সংক্ষেপে এইরকম : লোকালয় থেকে বহুদূরে হিমালয় পর্বতের দুর্গম কোন এক গিরিগুহায় কঠোর তপস্যায় রত ভগবদ্ভক্ত এক সাধক একদিন হঠাৎ করেই তার শিষ্যের সাথে জড়িয়ে পড়েন বিতর্কে। শিষ্যটি এসেছিল রোম থেকে। সে নিরন্তর প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তার গুরুকে।

এবং একসময় সে তাকে এটাও জানায় যে সে একজনকে ভালবাসে যাকে সে ফেলে এসেছে তার সেই সুদূর জন্মভূমিতে। ভগবদ্ভক্ত গুরু স্পষ্টতই তার শিষ্যের এহেন 'অধঃপতনে' বিব্রত বোধ করেন এবং তিনি তাকে বোঝাতে শুরু করেন দৃশ্যমান এই জগত সংসারের অর্থহীনতা। হিংসা, দ্বেষ ও পাপে পূর্ণ এই জগত যে আসলে দুঃখের আগার, একমাত্র সেই সর্বশক্তিমান নিত্য ঈশ্বরের আরাধনাই যে কাঙ্ক্ষিত স্বর্গসুখের মূল চাবিকাঠি, এই কথাই তিনি বলতে থাকেন শিষ্যটিকে। কিন্তু শিষ্যটি এতে তার প্রবল অস্বীকৃতি জানায় এবং বলে ওঠে —

Perchance,
There is much suffering in this world;
But say, should wisdom war
with pain or shrink ?

বলে ওঠে —

I know,
How much has been,
and how much may be done
But would you root out sympathy, and tear
A generous passion from
the human breast?
O sir ! forgive my youth : but I do think,
That man must be man's
brother and his friend.

এরপর সে তার প্রিয় প্রেমাস্পদার রূপ বর্ণনা করতে শুরু করে এবং শেষে বলে যে, এর জন্য তার বিন্দুমাত্র পাপবোধ নেই। কারণ এ যদি তার কোন ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে সেই ত্রুটি এই জগতেরই, এবং এই ত্রুটি থেকে অন্ততঃ পাপের জন্ম হয় নি।

If I have erred, 'tis as the world has erred
But from that error evil has not sprung.

বস্তুতঃ 'A Dramatic Sketch'-এ ডিরোজিওর যে জীবনদর্শনের দ্যোতনা, তা তাঁর বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা-চেতনাকেই প্রতিফলিত করে; এবং এই বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা দার্শনিক বিচারে যান্ত্রিক বস্তুবাদকেও ছাড়িয়ে উঠেছে। কারণ ডিরোজিও সমস্তরকম অতীন্দ্রিয় ভাবকে বর্জন করেও শেষ পর্যন্ত মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, আবেগ ও অনুভূতির অস্তিত্বকে স্বীকৃতি জানাননি, যেটা অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের প্রায় সমস্ত যান্ত্রিক বস্তুবাদীরাই করেছেন। এমনকি, 'The Poetry of Human Life' কবিতায় তিনি একথাও বলেছেন — "But man has thoughts to which he giveth form" — যা তাঁর চিন্তার অনন্যতাকেই সূচিত করে। অর্থাৎ, 'মানুষ' আছে বলেই 'চিন্তা' রয়েছে এবং এই চিন্তাই রূপ লাভ করে 'ফর্ম'-এ; যদিও এই চিন্তা ও ফর্মের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপ কী এবং এ দুয়ের মধ্যে ফর্মই যে শেষ বিচারে সমস্ত রকম ভাবগত উৎপাদনের ভিত্তিরূপে কাজ করে, তা নির্ধারণ করার মত দার্শনিক প্রতীতি তিনি অর্জন করেননি। করা সম্ভবও ছিল না। কারণ এর জন্য যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োজন ছিল তা তখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল পৃথিবীতে।

মানুষ এবং প্রকৃতিকে বিজড়িত করে এই যে বিরাট বিশ্বজগত, ডিরোজিও তার মধ্যেই আজীবন তাঁর সত্যকে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। এবং এই তীব্র অন্বেষণেই তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর প্রত্যয়, যা শেষ বিচারে মানুষকেই মহত্তম আসন দান করে, এমনকি প্রকৃতির উপরেও। 'The Poetry of Human Life' কবিতায় তিনি বোধহয় তাই সেদিন বলতে পেরেছিলেন —

Aye ; human life is truly full of all
That beauty and that magic which can call
Imaginings more proud
and glorious forth,
Than all the stars of heaven
and flowers of earth.

বস্তুত জীবনের এই প্রত্যয়ের উপরই ডিরোজিওর সুগভীর দেশাত্মবোধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর অবিমিশ্র ঘৃণা, মানবমুক্তির আকুতি, তাঁর যুক্তিবাদিতা — সমস্ত কিছুই প্রতিষ্ঠিত। এরই প্রণোদনায় এদেশের মানুষের দুঃখে তাঁর চোখ থেকে জল ঝরে পড়েছে। এরই প্রেরণায় তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে এদেশের নারীদের যন্ত্রণাদীর্ণ জীবন। এই প্রত্যয় রচনা করেছে তাঁর অনন্য বিদ্রোহ। অথচ বিনিময়ে তিনি পাননি কিছুই — শুধু সেদিনের সেই নিষ্করুণ সমাজের লাঞ্ছনাটুকু ছাড়া!

যুক্তি ও উপলব্ধি সমৃদ্ধ প্রবন্ধকার

নিজের স্বল্প পরিসর জীবনে ডিরোজিও খুব সামান্য গদ্যই রচনা করতে পেরেছিলেন। যদিও তারও মধ্যে হদিশ মেলে না অনেকগুলির। শোনা যায়, বিখ্যাত জার্মান ভাববাদী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের দর্শনের উপর তিনি সেসময় তাঁর ওই অল্প বয়সেই একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যেটা পড়ে চমকে উঠেছিলেন অনেকেই। এ প্রসঙ্গে বি. বি. শা সম্পাদিত 'Poetical Works of H.L.V. Derozio, Vol-1' গ্রন্থের ভূমিকায় ই. ডবলিউ. মেজ লিখেছিলেন, "... His objections to the philosophy of Emanuel Kant, which Rev. Dr. W. H. Mill, Principal of the Old Bishop's College, declared before a large audience, were perfectly original and displayed powers of reasoning and observation which would not disgrace even the gifted philosophers". কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ডিরোজিওর এই অত্যন্ত মূল্যবান রচনাটি পরবর্তীকালে কেউ-ই খুঁজে পাননি। এমনকি রচনাটি সেসময় কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা, জানা যায় নি তা-ও।

ডিরোজিওর গদ্য রচনার যেটুকু নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়, তাতে তাঁর অধ্যয়নের ব্যাপ্তি, গভীরতা এবং সেই সাথে তাঁর সুগভীর মননশীলতার স্বাক্ষর পরিস্ফুট। তিনি সেখানেও তাঁর মৌলিকত্বের ছাপ রেখে গেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'Education in India', 'Locke's Style & Reasoning', 'On Moral Philosophy', 'On the Colonization of India by Europeans', 'Hindu Widow' ইত্যাদি নিবন্ধগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি, স্ব-সম্পাদিত 'The East Indian' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন লেখাগুলিও উপেক্ষণীয় নয়।

ডিরোজিও এদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর গদ্যরচনাগুলি পাঠ করলে বোঝা যায়, নিছক কাঁচের ঘরে বসে সৌখিন কাব্য-সাহিত্যের চর্চা তিনি করেন নি। তাঁর দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল এদেশের মানুষের প্রতি। তাঁর দেশাত্মবোধ তাঁকে রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রেও এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করে তুলেছিল। তিনি এই দেশ, দেশের মানুষ, তাদের কল্যাণ এবং এদেশে বিদেশীর শাসন সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলতে পেরেছিলেন যা ওইরকম একটা সময়ে উচ্চারণ করা ছিল রীতিমত দুঃসাহসের ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'On the Colonization of India by Europeans' নামক একটি গদ্যরচনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে 'ক্যালাইডোস্কোপ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই নিবন্ধটিতে ডিরোজিও লিখেছিলেন —

"It was observed by a former Governor General, that this was an empire of opinion; and this observation has been widely circulated by those who have been either too idle or unwilling to substitute, for the fallacies of imagination, the dictates of truth. The most superficial observer must perceive that India is maintained in subjection only by Military Force — withdraw it, and the boasted opinion of the natives, instead of supporting, would immediately prove the cause of the utter subversion of the empire".

অর্থাৎ, যারা মনে করে এদেশে ইংরেজের সাম্রাজ্য দেশের মানুষের সহযোগিতা ও সমর্থনের ভিত্তিতে টিকে আছে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। অথচ, আজ এটা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার যে, যে প্রভুত্ব ইংরেজরা এদেশে চালাচ্ছে তার একমাত্র ভিত্তি হল তাদের মিলিটারি শক্তি, যা সরিয়ে নিলে তাদের সাম্রাজ্য এক মুহূর্তেই ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। তখন বোঝা যাবে, এদেশের বঞ্চনাপীড়িত অসংখ্য মানুষ কী দৃষ্টিতে তাদের দেখে!

দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদবোধের জায়গা থেকে এদেশের বাস্তব সমাজ পরিস্থিতি ডিরোজিও কত গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর আরেকটি লেখা থেকে। একবার দেশীয় উদ্যোগে কলকাতায় ইংরেজী 'থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নব্যবঙ্গের প্রগতিশীল সমাজ নেতারা উদ্যোগী হয়ে উঠলে ডিরোজিও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছিলেন—

"A theatre among the Hindoos, with the degree of knowledge they at present possess, will be like building a palace in the waste. Useful information should precede amusement : at least, wise men will consider that proper. — Let the Hindoos receive degree of knowledge before they are to be entertained with theatres.

... We recommend our Hindoo patriots and philanthropists to instruct their countrymen,by means of schools; and when they are fitted to appreciate the dramatic compositions of refined nations, it will be quite time enough to errect a theatre". (India Gazette, Sept. 14, 1831)

বস্তুত, দেশ ও সমাজ সম্পর্কে চিন্তার এই গাঢ়ত্ব এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির এই রকম আরও অনেক নজির ডিরোজিওর সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। অথচ ভাবলে অবাক লাগে, তাঁর কোন উল্লেখ এদেশে পরবর্তীকালের সাহিত্যিকেরা প্রায় করেনই নি। না বঙ্কিমচন্দ্র, না রবীন্দ্রনাথ, না আর কেউ। কিন্তু কেন? এর কারণ কি এই যে তিনি এতই অল্পবয়েসী ছিলেন যে তাঁকে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার প্রয়োজন এঁরা বোধ করেননি, নাকি 'ভয়ংকর' সেই ডিরোজিও ফেনোমেননটাকেই সর্বান্তঃকরণে ভুলতে চেয়েছিল পরবর্তীকালের গোটা হিন্দুসমাজ? কিন্তু কারণ যাই হোক, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, একমাত্র রামমোহন ও বিদ্যাসাগরকে বাদ দিলে তিনিই ছিলেন গোটা উনিশ শতকীয় পর্বের সেই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব যাঁর আধখানাকে প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলন এবং বাকী আধখানাকে আপসমুখী প্রাচীন ঐতিহ্যবাদের

সাথে মিশ খাইয়ে নিয়ে চলা ছিল অসম্ভব। আবার এও ঠিক যে বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে ভেতর থেকে আঘাত করতে তিনি পারেননি। তিনি ছিলেন দু'দিকেই ধারওয়ালা সেই খোলা তরবারি যা হাতে নিতে পরবর্তীকালে এমনকি তাঁর শিষ্য-অনুগামীরাও পিছিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এটা তাঁর ব্যক্তিগত কোন দুর্ভাগ্য নয় বলেই মনে হয়। কারণ সম্মিলিতভাবে রামমোহন-বিদ্যাসাগরদের ধারা থেকে অনেক অনেক দূরে সরে এসে এদেশের নবজাগরণ শেষ পর্যন্ত যে গাড্ডায় গিয়ে পড়েছিল তাকে মানবসভ্যতার পক্ষে কল্যাণকর বলা যায় না কিছুতেই। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ছিল আদর্শগতভাবে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া, জাত-পাত-সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তরলমতি সেই স্ববিরোধী জাতির উত্থান যার আত্মঘাতী মানসিকতার বীজ সঞ্চারিত হয়ে চলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। আমরাও হয়ত সেই ধারাবাহিকতাতেই এসেছি। বাস্তবিক, আজও যখন দেখি সংস্কার ও আপ্তবাক্যের অসহ্য দাপট সমাজের প্রতিটা স্তরেই, যখন দেখি আমাদের প্রযুক্তি-পারঙ্গম 'সাধের' তরুণ প্রজন্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শক্তিহীন, তখন এটা ভাবতে সত্যিই কষ্ট হয় যে, আজ থেকে দেড়শো বছরেরও বেশি সময় আগে এদেশের মাটিতেই 'Truth' ও 'Reason'-এর জন্য ডিরোজিও জীবন দিয়েছিলেন, কবিতা লিখেছিলেন এদেশের মানুষের সমস্তরকম অন্ধত্ব ও ক্রীতদাসত্বের বিরুদ্ধে। আমরা সচেতনভাবেই মনে রাখি নি তাঁকে। এর দায় আমাদের নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে ডিরোজিওরই লেখা একটি কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি—

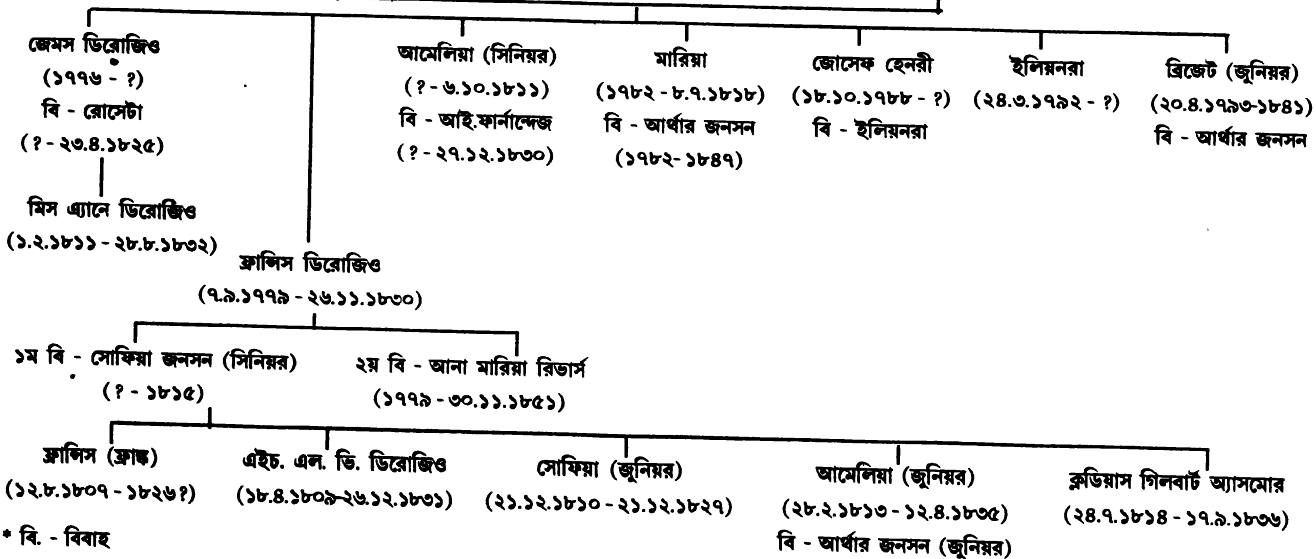
"We look around
But vainly look for those who formed a part
Of us as we of them, and when we wore
Like gems in bezels, in the heart's deep core,
Where are they now? Gone to that 'narrow cell'.
Where glooms no lamp hath broken nor shall break,
Where secrets never spirit came to tell —
Oh ! that their day might dawn, for then
They would awake..."

ডিরোজিওর জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

১৮ এপ্রিল ১৮০৯	:	ডিরোজিওর জন্ম। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে দ্বিতীয়। জন্মস্থান : ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোড (বর্তমানে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড)। মৌলালি দরগার সামান্য দক্ষিণে। পিতা : ফ্রান্সিস ডিরোজিও মা : সোফিয়া জনসন
১২ আগস্ট ১৮০৯	:	সেন্ট জন্‌স চার্চে রেভা. জেমস ওয়ার্ড কর্তৃক ডিরোজিওর খ্রিস্টীয়করণ।
১৮১৩	:	স্কটল্যান্ডের ফাইফশায়ার শহর থেকে কলকাতায় ডেভিড ড্রামন্ডের আগমন।
১৮১৪	:	দেশীয় হিন্দু এবং ইউরেশিয়ান পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ধর্মতলায় ড্রামন্ডের স্কুল স্থাপন।
১৮১৫	:	শিক্ষালাভের জন্য ড্রামন্ডের স্কুলে ছয় বছর বয়সে ডিরোজিওর প্রবেশ। মা সোফিয়া জনসনের মৃত্যু।
১৮১৬	:	ডিরোজিওর পিতার পুনরায় বিবাহ। পাত্রী আনা মারিয়া রিভার্স।
১৮২৩	:	ড্রামন্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতে প্রথাগত শিক্ষার আকস্মিক পরিসমাপ্তি। পিতার কর্মস্থল মেসার্স জেমস্ অ্যান্ড স্কট কোম্পানিতে চাকরী গ্রহণ।
১৮২৫	:	ভাগলপুরে মাসীর কাছে যাত্রা।
১৮২৬	:	কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। গ্রান্টের 'ইন্ডিয়া গেজেটে' সহকারী সম্পাদক এবং হিন্দু কলেজে চতুর্থ শিক্ষকের পদে যোগদান। বড় ভাই ফ্রাঙ্কের মৃত্যু কুড়ি বছর বয়সে (?)।
১৮২৭	:	প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'Poems'-এর প্রকাশ (মে)। বড় বোন সোফিয়া (জুনিয়র)-এর মৃত্যু সতেরো বছর বয়সে।

১৮২৮	:	'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'The Fakeer of Jungheera'-এর প্রকাশ (মার্চ)।
১৮২৯	:	একদিকে রামমোহনের সতীদাহপ্রথা বিরোধী আন্দোলন, বেন্টিঙ্কের সতীদাহ রদকারী আইন, অন্যদিকে ডিরোজিওর নেতৃত্বে হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের সামন্তী অন্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মুক্তবুদ্ধিজাত বিদ্রোহ। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য গোড়া রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ।
১৮৩০	:	'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র মুখপত্র স্বরূপ 'পার্থেনন' পত্রিকার প্রকাশ (ফেব্রুয়ারি)। প্রধান উদ্যোক্তা ডিরোজিওর অন্যতম অনুগামী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
ফেব্রুয়ারি ১৮৩০	:	ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের উদ্দেশে হিন্দু কলেজ ম্যানেজিং কমিটির প্রথম সতর্কবার্তা।
২৬ নভেম্বর ১৮৩০	:	পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিওর মৃত্যু।
জানুয়ারি ১৮৩১	:	কলেজের ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক প্রেরিত দ্বিতীয় সতর্কবার্তা।
২৩ এপ্রিল ১৮৩১	:	কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই ম্যানেজিং কমিটির অধিবেশনে রক্ষণশীলদের চাপে ডিরোজিওকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করার প্রস্তাব গ্রহণ। কমিটির অন্যতম সদস্য এইচ এইচ উইলসন কর্তৃক ডিরোজিওকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার পরামর্শ জানিয়ে পত্র প্রেরণ।
২৫ এপ্রিল ১৮৩১	:	ডিরোজিওর কলেজ থেকে পদত্যাগ।
১ জুন ১৮৩১	:	নিজস্ব সম্পাদনায় দৈনিক 'দ্য ইস্ট ইন্ডিয়ান' পত্রিকার প্রকাশ।
১৯ ডিসেম্বর ১৮৩১	:	কলেরায় আক্রান্ত।
২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১	:	মৃত্যু।

ডিরোজিওর বংশ তালিকা



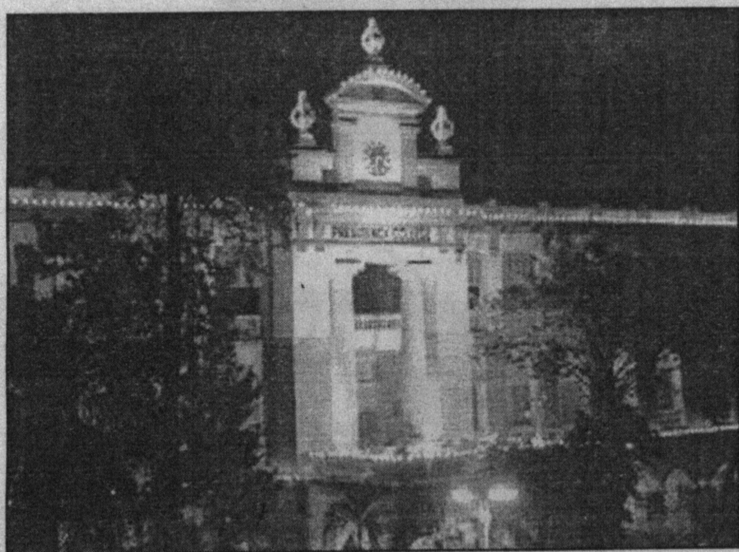
মাইকেল ডিরোজিও
পর্তুগিজ। নেটিভ প্রোটেস্ট্যান্ট
(২২.৮.১৭৪২-২২.৮.১৮০৯)
ব্রিজেট ডিরোজিও (সিনিয়র)
(১৭৫৬-৩০.৬.১৮৩২)
জেমস ডিরোজিও
(১৭৭৬ - ?)
বি - রোসেটা
(? - ২৩.৪.১৮২৫)
মিস এ্যানে ডিরোজিও
(১.২.১৮১১ - ২৮.৮.১৮৩২)
আমেলিয়া (সিনিয়র)
(? - ৬.১০.১৮১১)
বি - আই.ফার্নান্দেজ
(? - ২৭.১২.১৮৩০)
মারিয়া
(১৭৮২ - ৮.৭.১৮১৮)
বি - আর্থার জনসন
(১৭৮২- ১৮৪৭)
জোসেফ হেনরী
(১৮.১০.১৭৮৮ - ?)
বি - ইলিয়নরা
ইলিয়নরা
(২৪.৩.১৭৯২ - ?)
ব্রিজেট (জুনিয়র)
(২০.৪.১৭৯৩-১৮৪১)
বি - আর্থার জনসন
ফ্রান্সিস ডিরোজিও
(৭.৯.১৭৭৯ - ২৬.১১.১৮৩০)
১ম বি - সোফিয়া জনসন (সিনিয়র)
(? - ১৮১৫)
২য় বি - আনা মারিয়া রিভার্স
(১৭৭৯ - ৩০.১১.১৮৫১)
ফ্রান্সিস (ফ্রাঙ্ক)
(১২.৮.১৮০৭ - ১৮২৬?)
এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও
(১৮.৪.১৮০৯-২৬.১২.১৮৩১)
সোফিয়া (জুনিয়র)
(২১.১২.১৮১০ - ২১.১২.১৮২৭)
আমেলিয়া (জুনিয়র)
(২৮.২.১৮১৩ - ১২.৪.১৮৩৫)
বি - আর্থার জনসন (জুনিয়র)
ক্লডিয়াস গিলবার্ট অ্যাসমোর
(২৪.৭.১৮১৪ - ১৭.৯.১৮৩৬)
* বি. - বিবাহ



কলকাতার এসপ্ল্যানেডে ডিরোজিওর আবক্ষ মূর্তি



দক্ষিণ পার্ক স্ট্রিটের সুপ্রাচীন গোরস্থানে ডিরোজিওর সমাধি



হিন্দু কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা)



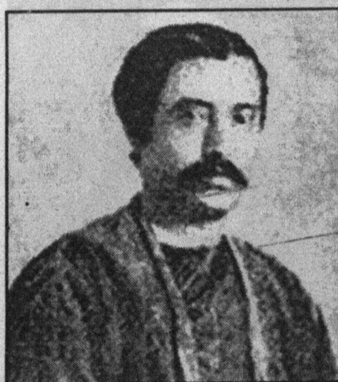
রাজা রামমোহন রায় (২৩.৫.১৭৭২-২৭.৯.১৮৩৩)



রাধাকান্ত দেব (১০.৩.১৭৮৩-১.৯.১৮৬৭)



ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২)



রামগোপাল ঘোষ
(১৮১৪/১৮১৫-২৫.১.১৮৬৮)



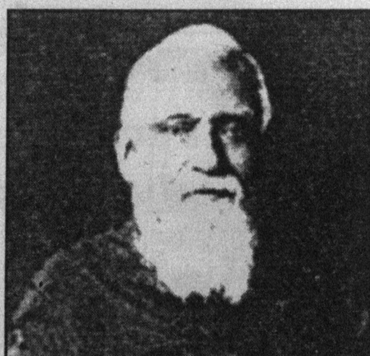
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
(১৮১৪-১৮৭৮)



কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৮১৩-১১.৫.১৮৮৫)



প্যারীচাঁদ মিত্র
(২২.৭.১৮১৪-২৩.১১.১৮৮৩)



রামতনু লাহিড়ী
(১৮১৩-১৩.৮.১৮৯৮)

ডিরোজিওর কবিতা

The Harp of India

Why hang'st thou lonely on yon withered bough?
Unstrung for ever, must thou there remain;
Thy music once was sweet — who hears it now?
Why doth the breeze sigh over thee in vain?
Silence hath bound thee with her fatal chain;
Neglected, mute, and desolate art thou,
Like ruined monument on desert plain :
O ! many a hand more worthy far than mine
Once thy harmonious chords to sweetness gave,
And many a wreath for them did Fame entwine
Of flowers still blooming on the minstrel's grave
Those hands are cold — but if thy notes divine
May be by mortal wakened once again,
Harp of my country, let me strike the strain !

('Poems' কাব্য সংকলনের অন্তর্গত। রচনাকাল মার্চ, ১৮২৭)

To India — My Native Land

My country ! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast.
Where is that glory, where that reverence now?

Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou :
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery !
Well — let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country ! one kind wish from thee !

('ফকীর অফ জঙ্গীরা' কাব্যের মুখবন্ধস্বরূপ ডিরোজিও এই কবিতাটি রচনা করেন। প্রকাশকাল-১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ।)

Thermopylæ

Is there none to say, 'Twas well' ?
Shall not Fame their story tell,
Why they fought, and why they fell?
'Twas to be free !

O ! who would live a crouching slave,
While yet this earth can give a grave ?
Who would not rather death than shame,
While thinking on thine awful name,
Thermopylæ?

Small their number, high their pride,
Great they lived, and nobly died,
Friends and brothers, side by side,
Within that pass :

His barbarous hordes, and countless hosts
The Persian brought from distant coasts;
Like hunted deer those hosts were slain;
Before thine arm their might was vain,
Leonidas!

Curse on him who did betray
Sparta's sons, and showed the way
Where every hope of victory lay
To Persia's bands!

But Sparta's sons, a hero each,
Did, on that day, a lesson teach
How liberty in death is won,
What deeds with Freedom's sword are done
In freemen's hands !

Circled by a sea of blood,
Pressed by thousands, still they stood,
Fighting, falling, unsubdued,
Unconquered still.

They scorned to breathe the breath of slaves,
They fought for free and hallowed graves;
And though they fell in glory's hour,
The Persian overcame their power,
But—not their will !

Let them rest—nought could appal
Those who armed at Honour's call :
Fell they not as heroes fall—
For Liberty?

Then, let them rest—their race is run;
O ! let them rest; their day is done;
They found them each a glorious grave,
But still their fame is on thy wave,
Thermopylæ!

('**Poems**' কাব্য সংকলনের অন্তর্গত। রচনাকাল-ডিসেম্বর, ১৮২৬)

Sonnet to the Pupils of the Hindu College

Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds,
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers,
That stretch (like young birds in soft summer hours)
Their wings, to try their strength. O, how the winds
Of circumstances, and freshening April showers
Of early knowledge, and unnumbered kinds
Of new perceptions shed their influence;
And how you worship truth's omnipotence.
What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity,
Weaving the chaplets you have yet to gain,
Ah then I feel I have not lived in vain.

All is Lost, Save Honour

It was after this decisive blow that Francis wrote the justly celebrated Spartan letter to his mother, containing the following words only — "Madam, all is lost, save Honour."

Thurtle's History of France

My path of life an adverse fiend,
In evil hour, hath crost,
My sceptre from my hand is riven,
Save Honour, all is lost !

My yeomen good all bathed in blood
Lie on the battle field,

And many a gallant knight who bore
High crest on blazoned shield.

Against my warrior-band was laid
Full many a lance in rest,
But every foeman's lance was broke
Within a hero's breast.

The spoiler now may seize my realm,
The stranger fill my throne;
But let them take the world from me,
So Honour be my own.

My heart will bleed to think, fair France !
Of thee, and all thy woes;
Thou ne'er may'st know for years, perchance,
A moment of repose.

Perchance — but from yon star on high
Proceeds a heavenly strain,
It bids me hope for better days
When France shall smile again.

What though my sceptre's snatched away?
My sword is in my hand;
What though my banner waves no more
In my loved native land?

My sceptre's snatched from me—but still
There's life-blood in my veins;
And though my kingdom fair is lost,
My Honour still remains.

Honour remains! but all beside
Is lost, is lost to me;

And cold on Pavia's fatal plain
Sleeps, France! thy chivalry.

There let them rest; unconquered there
They sleep the hero's sleep;
Like men they fell in glory's cause,
For them we should not weep.

We should not weep for them; they rest
Unconscious of our cares;
Who envies not their bed of death?
For Honour still is their's!

And here I roam like ocean-weed
Upon the billows tost —
Where are my warriors, where's my crown?
Save Honour—all is lost!

Save Honour, all is lost; but still
While Honour yet remains,
It fires me with the hope to break
The conquering tyrant's chains.

With one fond wish for fairest France
My heart is swelling high,
And oh! for all her future ills
One tear bedims mine eye.

But, cheer thee up my drooping heart,
Though by misfortune crost;
Hope still shall light thee on to fame,
For honour is not lost!

(**'Poems'** কাব্য সংকলনের অন্তর্গত। রচনাকাল—এপ্রিল, ১৮২৭)

Sonnet

Where are thy waters, Lethe? — I would steep
My past existence in their source, and sleep
In Death's cold sheltering arms, if they but turn
The shafts of grief aside, and keep me free
From all the bitterness of misery,
And all those tyrant agonies, which burn
My brain, and heart eternally. O ! Life
Why dost thou love me so—do I not hate
Thee, and thy gifts accursed?—but there's a strife
My soul has long engaged in—'tis with fate;
And in my sorrow, I am half elate
With something kin to joy, that I must be
Soon in that conflict vanquished—then from thee
Loathsome existence ! shall I separate.—

('ফকীর অফ জঙ্গীরা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।)

Independence

Look on that lamp which seems to glide
Like a spirit o'er the stream,
Casting upon the darkened tide
Its own mysterious beam.

My heart, — and shall that little lamp,
My glorious image be;
Shall the night so mirk, the stream so damp
Be lit, and cheered by thee?

Lo ! In the breath of the tyrant wind
    The trembling flame looks wan,
And pale, as if fear had seized its mind;
    It fades, alas, 'tis gone!

And wilt thou tremble so, my heart,
    When the mighty breathe on thee?
And shall thy light, like this, depart?
    Away ! it cannot be.

ডিরোজিওর গদ্য রচনা

Hindu Widow

The whole of this passage has reference to a mistaken opinion, somewhat general in Europe, namely, that the Hindu Widow's burning herself with the corpse of her husband, is an act of unparalleled magnanimity and devotion. To break those illusions which are pleasing to the mind, seems to me a task which no one is thanked for performing; nevertheless, he who does so, serves the cause of Truth. The fact is, that so far from any display of enthusiastic affection, a Suttee is a spectacle of misery, exciting in the spectator a melancholy reflection upon the tyranny of superstition and priest-craft. The poor creatures who suffer from this inhuman rite, have but little notion of the heaven and the million years of uninterrupted happiness to which their spiritual guides tell them to look forward. The choice of immediate death, or a protracted existence, where *to be* only must content their desire, is all that is offered to them; and who under such circumstances would hesitate about the preference? The most degrading and humiliating household offices must be performed by a Hindu Widow; she is not allowed more food than will suffice to keep her alive; she must sleep upon the bare earth, and suffer indignities from the youngest members of her family; these are only a few of her sufferings. The philanthropic views of some individuals are directed to the abolition of widow-burning; but they should first ensure the comfort of these

unhappy women in their widowhood, — otherwise, instead of conferring a boon upon them, existence will be to many a drudge, and a load.

('ফকীর অফ জঙ্গীরা' কাব্যের পরিশিষ্টে ডিরোজিও কিছু মন্তব্য (notes) সংযোজিত করেছিলেন। উপর্যুক্ত রচনাটি সেখান থেকেই নেওয়া।)

Acknowledgement of Errors

It has been frequently maintained, the parents and instructors should behave in such a manner towards children as to lead them to suppose that they are infallible. This is very generally practised and there are few boys who do not think that their masters are the most perfect and accomplished personages in the world. This is fraught with mischief, and should be discouraged. It makes boys take opinions upon trust — the cause of all the prejudices and errors that exist.

I, this day [19th Oct, 1829], most rashy, told, one of my students that I disbelieved him—a circumstance which has given me much sorrow. It appeared afterwards that I was mistaken : and I confessed my indiscretion before the whole class.

Who censures me for this, and tells me that I gave the boy an opportunity to triumph? — I reply, that it was the least I could have done, after having hurt his feelings, and wounded his honour. Pride and pedantic authority might have directed the adoption of another course; but *Justice* required that even a man should have made due reparation to a child whom he had offended.

(ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট—৩ জানুয়ারি ১৮৩৫)

উইলসনকে লেখা ডিরোজিওর ঐতিহাসিক চিঠি

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটি এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে ডিরোজিওকে কলেজ থেকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ডিরোজিও ম্যানেজিং কমিটিকে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন ২৫ এপ্রিল। সেই সাথে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ উইলসনকে একটি চিঠিও লেখেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে উইলসন ওই ২৫ এপ্রিল তারিখেই ডিরোজিওর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করে একটি চিঠি লেখেন। এর প্রত্যুত্তরে পরদিন অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল ডিরোজিও উইলসনকে লেখেন তাঁর ঐতিহাসিক চিঠিটি। এখানে ডিরোজিওকে লেখা উইলসনের এবং উইলসনকে লেখা ডিরোজিওর চিঠি—দুটোই উদ্ধৃত করা হল:

ডিরোজিওকে লেখা উইলসনের চিঠি

To
H. L. V. DEROZIO, ESQ
Dear Derozio,

I believe you are right, although I could have wished you had been less severe upon the native Managers, whose decision was founded merely upon the expediency of yielding to popular clamour, the justice of which it was not incumbent on them to investigate. There was no trial intended, there was no condemnation. An impression had gone abroad to your disadvantage, the effects of which

were injurious to the College, and which would not have been dispelled by any proof you could have produced, that it was unfounded. I suppose there will still be much discussion on the subject, privately only I trust, but that there will be; and I should like to have the power of speaking confidently on three charges brought against you. Of course, it rests entirely with you to answer my questions. Do you believe in a God? Do you think the respect and obedience to parents no part of moral duty? Do you think the intermarriage of brothers and sisters innocent and allowable? Have you ever maintained these doctrines by argument in the hearing of our scholars? Now I have no right to interrogate you on these or any other of your sentiments, but these are the rumoured charges against you, and I should be very happy if I could say boldly they are false; or could produce your written and unqualified denial for the satisfaction of those whose good opinion is worth having.

Yours sincerely

Apirl 25, 1831 H. H. WILSON

ডিরোজিওর প্রত্যুত্তর

To
H. H. Wilson, ESQ

My Dear Sir,

Your letter, which I received last evening, should have been answered earlier but for the interference of other matters which required my attention, I beg your acceptance of this apology for the delay, and thank you for the interest which your most excellent communication proves that you

continue to take in me. I am sorry, however, that the questions you have put to me will impose upon you the disagreeable necessity of reading this long justification of my conduct and opinions. But I must congratulate myself that this opportunity has afforded me of addressing so influential and distinguished an individual as yourself upon matters which, if true, might seriously affect my character. My friends need not, however, be under any apprehension for me; for myself the consciousness of right is my safeguard and my consolation.

(i) I have never denied the existence of a god in the hearing of any human being. If it be wrong to speak at all upon such a subject, I am guilty; but I am neither afraid, nor ashamed to confess having stated the doubts of philosophers upon this head, because I have also stated the solution of these doubts. Is it forbidden anywhere to argue upon such a question? If so, it must be equally wrong to adduce an argument upon either side, or is it consistent with an enlightened notion of truth to wed ourselves to only one view of so important a subject, resolving to close our eyes and ears against all impressions that oppose themselves to it?

How is any opinion to be strengthened but by completely comprehending the objections that are offered to it, and exposing their futility? And what have I done more than this? Entrusted as I was for sometime with the education of youth, peculiarly circumstanced, was it for me to have made them pert and ignorant dogmatists, by permitting them to know what could be said upon only one side of grave questions? Setting aside the narrowness of mind which such a course might have been evinced, it would have been injurious to the mental energies and aquirements of

the youngmen themselves. And (whatever may be said to the contrary) I can indicate my procedure by quoting no less orthodox authority than Lord Bacon : "If a man" says this philosopher (and no one ever had a better right to pronounce an opinion upon such matters than Lord Bacon) "will begin certainties, he shall end in doubt". This, I need scarcely observe, is always the case with contented ignorance, when it is roused too late to thought, one doubt suggests another, and universal scepticism is the consequence. I therefore thought it my duty to acquaint several of the College students with the substance of Hume's celebrated dialogue between Cleanthes and Philo, in which the most subtle and refined arguments against Theism are adduced. But I have also furnished them with Dr. Reid's and Dugald Stewart's more acute replies to Hume,—replies which to this day continue unrefuted. "This is the head and front of my offending." If the religious opinions of the students having become unhinged in consequence of the course I have pursued, the fault is not mine. To produce convictions was not within my power; and If I am to be condemned for the Atheism of some, let me receive credit for the *Theism* of others. Believe me, my dear Sir, I am too thoroughly imbued with the deep sense of human ignorance, and of the perpetual vicissitudes of opinion, to speak with confidence even of the most unimportant matters. Doubt and uncertainty besiege us too closely to admit the boldness of dogmatism to enter an enquiring mind, and far be it from me to say *"that is"*, and *"that is not"*, when after the most extensive acquaintance with the researches of science, and after the most daring flights of genius, we must confess with sorrow and disappointment that humility becomes the highest wisdom—

for the highest wisdom assures man of his ignorance.

(ii) Your next question is, "Do you think respect and obedience to parents no part of moral duty?" For the first time in my life did I learn from your letter that I am charged with having inculcated so hideous, so unnatural, so abominable a principle. The authors of such infamous fabrications are too degraded for my contempt. Had my father been alive, he would have repelled the slander by telling my calumniators, that a son who had endeavoured to discharge every filial duty as I have done, could never have entertained such a sentiment; but my mother can testify how utterly inconsistent it is with my conduct, and upon her testimony, I might risk my vindication. However, I will not stop there : so far from having ever maintained or taught such an opinion, I have always insisted upon respect and obedience to parents, I have indeed condemned that feigned respect which some children evince as being hypocritical and injurious to the moral character; but I have always endeavoured to cherish the sentient feelings of the heart, and to direct two important ones for your satisfaction, and as the parties are always at hand, you may at any time substantiate what I say. About two or three months ago, Dukhinanundun Mookeerjee (who has made so great a noise lately) informed me that his father's treatment of him had become utterly insupportable, and that his only chance of escaping it was by leaving his father's home. Although I was aware of the truth of what he had said, I dissuaded him from taking such a course, telling him that much should be endured from a parent, and that the world would not justify his conduct if he left his home without being actually turned out of it. He took my advice, though I regret to say only for a short time. A few weeks ago he left his father's house,

and to my great surprise engaged another in my neighbourhood. After he had completed his arrangements with his landlord, he informed me for the first time of what he has done, and when I asked him why he had not consulted me before he took such a step : "because", replied he, "I knew you would have prevented it."

The other instance relates to Mohesh Chunder Sing, having recently behaved rudely to his father and offended some of his other relatives, he called upon me at my house with his uncle Umachurn Bose and his cousin Nundolal Sing. I reproached him severely for his contumacious behaviour, and told him that, until he sought forgiveness from his father, I would not speak to him. I might mention other cases, but these may suffice.

(iii) "Do you think marriages of brothers and sisters innocent and allowable?" This is your third question. "No" is my distinct reply; and I never taught such an absurdity. But I am at a loss to find out how such misrepresentations as those to which I have been exposed, have become current. No person who has ever heard me speak upon such subjects could have circulated these untruths; at least, I can hardly bring myself to think that one of the college students with whom I have been connected could be either such a fool as to mistake everything I ever said, or such a knave, as wilfully to mistake my opinions. I am rather disposed to believe that weak people who are determined upon being alarmed, finding nothing to be frightened at, have imputed these follies to me. That I should be called a sceptic and an infidel is not surprising, as these names are always given to persons who think for themselves in religion; but I assure you, that the imputations which you say are alleged against me, I have learned for the first time from

your letter, never having even dreamed that sentiments so opposed to my own, could have been ascribed to me. I must trust, therefore, to your generosity to give the most unqualified contradiction to these ridiculous stories. I am not a greater monster than most people, though I certainly should not know myself were I to credit all that is said of me. I am aware that for some weeks, some busy bodies have been manufacturing the most absurd and groundless stories about me, and even about my family. Some fools went so far as to say my sister, while others said my daughter (though I have not one) was to have been married a Hindu young man!!! I traced the report to a person called Brindabone Ghoshal, a poor Brahmin, who lives by going from house to house to entertain the inmates with the news of the day, which he invariably invents. However, it is a satisfaction to reflect that scandal, though often noisy, is not everlasting.

Now that I have replied to your questions, allow me to ask you, my dear Sir, whether the expediency of yielding to popular clamour can be offered in justification of the measures adopted by the Native Managers of the College towards me? Their proceedings certainly do not record any condemnation of me, but does it not look very like condemnation of a man's conduct and character to dismiss him from office when popular clamour is against him? Vague reports and unfounded rumours went abroad concerning me; the Native Managers confirm them by acting towards me as they have done. Excuse my saying it, but I believe there was a determination on their part to get rid of me, not to satisfy popular clamour, but their own bigotry. Had my religion and morals been investigated by them, they could

have had no grounds to proceed against me. They therefore thought it most expedient to make no enquiry, but with anger and precipitation to remove me from the Institution. The slovenly manner in which they have done so, is a sufficient indication of the spirit by which they were moved, for in their rage they have forgotten what was due even to common decency. Every person who has heard of the way in which they have acted is indignant, but to complain of their injustice would be paying them a greater compliment than they deserve.

In concluding this letter, allow me to apologise for its inordinate length; and to repeat my thanks for all that you have done for me in the unpleasant affair by which it has been occasioned.

I remain, Sir, & c.

April 26, 1831

H. L. V. DEROZIO

পরিশিষ্ট - ৪

কুৎসা ও কুৎসার জবাবে

‘সমাচার চন্দ্রিকা’ ও ‘সমচার দর্পণ’ পত্রিকা

ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করেছিল ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ ও ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকা। তরুণ ডিরোজীয়ানদের বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে কুৎসামূলক অনেক সংবাদই পরিবেশন করেছিল এরা। এর উদ্দেশ্য ছিল অসত্যমূলক নানা কাহিনী বিস্তারের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের সংকীর্ণ ধর্মীয় অভিমানকে খুঁচিয়ে তোলা যাতে গোটা সমাজকে ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ৬ নভেম্বর ১৮৩০ তারিখের সংখ্যায় ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ জনৈক ‘হিন্দুকালেজচ্ছাত্রস্য পিতুঃ’ নামক ব্যক্তির যে চিঠিটি প্রকাশ করে তার বয়ান ছিল এইরকম—

“...আমি বিদেশী মনুষ্য। এই শহরে বিষয় কর্ম্ম করি। শুনিলাম, হিন্দু কালেজ নামক পাঠশালায় বড় বিদ্যাচর্চ্চা, ছেলে পড়াইলেই বড় বিদ্বান হয়, আর বড় বড় সাহেবরা আসিয়া তাহার পরীক্ষা লয়েন। কৃতবিদ্য হইলে পরে রাজসরকারে বড় কর্ম্ম হইতে পারে ইহাতে লোভাকৃষ্ট হইয়া অতিক্লেশে মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করিয়া আপন বালককে দেশ হইতে আনিয়া ঐ কালেজে নিযুক্ত করিলাম। তাহাতে যে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি তাহা কিঞ্চিৎ লিখি।...

...পুত্রটি ঘরের কর্ম্ম কখন কখন দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত। কিন্তু কিছু কালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল। পরে দেশের রীত্যনুসারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক, অর্থাৎ চুল কাটা, সাপাতু, জুতাধারি, মালাহীন, স্নানবিহীন,

প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করে, শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান, জাতীয় বিষয়— অভিমানত্যাগী, উপদেশ কথা হইলেই Nonsense কহে।... মনে মনে ভাবিলাম যে, পুত্রের পুত্রত্ব হইবার লক্ষণ বটে ভাল, বিদ্যাবিষয়ে কি হইয়াছে জানিব।... পরে লেখার তজবীজ করিলাম। অতি কদক্ষর লেখে এবং অধিক লিখিতে পারে না। যে তরজমা করে তাহার বাঙ্গলা বুঝা যায় না। পাঁচটা অঙ্ক ঠিক দিতে পারে না, কসামাজা জানে না। নিমন্ত্রণপত্র কিম্বা বাজারের চিঠীখানা লিখিতে অক্ষম। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করে Nonsense ইত্যাদি; অর্থাৎ লিখনকার্য্য Drudgery, নীচ লোকের কর্ম্ম, সুন্দর অক্ষর লেখা Painting অর্থাৎ চিত্র করা, তাহাতে আবশ্যক নাই। পণ্ডিত হইলে কদর্য্য অক্ষরই লেখে। অপর কহে হিসাব করা নীচবৃত্তি।... পুত্রটি স্বজাতীয় স্বদেশীয় লোকের সভায় যাইতে চাহে না, এ সকল হইতে দূরে থাকিতে নিয়ত চেষ্টা করে। আমার নিকট আসিয়া বসিতে চাহে না, কারণ আমি ইঙ্গরেজী ভাল জানি না কিন্তু মূর্খ নহি। যাহা জানি তদ্বারা ধনোপার্জন করিয়া কালযাপন করিতেছি। সে যাহা হউক, সংপ্রতি ঐ সন্তানকে দেশানুসারে পোষাক দিলে কহে, আমি জগঝম্পওয়ালা বা কীর্ত্তনের পাইল নহি যে এমত পোষাক পরিব, বলে আমি মোজা ওয়াকিংশুজ ও ইজারআদি চাহি। তাহা কোথা পাইবে, সুতরাং এজন্য কোথাও যায় না। মনে করিলাম ছেলেটির বিদ্যাতে বিদ্যার মত হইল ভাল, অন্য ২ বালকের কি রীতি ইহা জানা উচিত। পরে দেখিলাম আমার বাচ্চার রীতি অন্য হইতে নূতন নহে, উপর উক্ত লক্ষণ সকলি আছে, অধিকন্তু যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চোর ও ডাকাইত, গরু বলে; পিতা পিতৃব্যদিগকে নির্ব্বোধ কহে, মিথ্যার সেবা যথেষ্ট করে কিন্তু বাহ্যে সত্যবাদির ন্যায়। ইহারা কেহ নাস্তিক, কেহ বা চার্ব্বাক, কেহ এক আত্মবাদী, কেহ বা দ্বৈত্যবাদী।... স্বদেশীয় তাবৎ বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ এবং প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অধৈর্য্য এবং অনেক বিষয়ে বিপরীত। ইহারা স্থানে স্থানে সভা করিয়াছে, তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিয়মের বিবেচনা করে। এই সকল দেখিয়া পুত্রের কালেজে যাওয়া রহিতকরণের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে না।...”

বলাবাহুল্য, 'সমাচার চন্দ্রিকা'র এই বক্তব্য ছিল অর্ধসত্য-অসত্যে পরিপূর্ণ। কলেজের ছাত্রদের শিক্ষার হাল সম্পর্কেও যে মন্তব্য করা হয়েছিল, তা-ও ছিল ভিত্তিহীন। কলেজের পরিদর্শক উইলসন সাহেবের ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্টে তার প্রমাণ আছে। রিপোর্টে উইলসন আগেকার (১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন পরিদর্শক নিযুক্ত হন সেই সময়কার) ছাত্রদের তুলনায় এখনকার (১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের) ছাত্রদের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে উন্নততর জ্ঞান এবং ইংরেজি রচনাশক্তির অসাধারণ উৎকৃষ্টতা দেখে নিজেই বিস্মিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন। লিখেছিলেন—

"Whilst those of the present first class, admit of no comparison with anything yet effected by the College, and far exceed the expectations which I then expresesed or entertained."

বলাবাহুল্য, এর কৃতিত্ব অনেকটাই ছিল ডিরোজিওর প্রাপ্য।

'সমাচার চন্দ্রিকা'র কুৎসার জবাব সেসময় দিয়েছিল 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা। এ প্রসঙ্গে ২২ জানুয়ারি ১৮৩১ তারিখে তাঁরা লেখে—

''হিন্দুকালেজ নামক যে বিদ্যালয় কয়েক বৎসরাবধি এদেশে স্থাপিত হওয়াতে সর্বসাধারণের যে উপকার হইতেছে,... চন্দ্রিকাকার তদ্বিষয়ে নিতান্ত অসুখী। তিনি যে কালেজস্থ অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগের অল্প অল্প দোষে তাহারদিগের প্রতি নানা দোষারোপ করিয়া চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতেই ব্যক্ত হইতেছে যে তিনি উক্ত কলেজের বিপক্ষ। কিন্তু তাঁহার এতাদৃশ বিপক্ষতার কি তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারি নাই। কেহ বলেন যে চন্দ্রিকাকার যে সর্ব্বশাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত ইহাই অনেকে জানেন, কিন্তু এইক্ষণে যে রূপ বিদ্যার প্রাচুর্য্য হইয়াছে এরূপ আর কিঞ্চিৎকাল থাকিলে তাঁহার এবং তত্তুল্য অন্যান্য লোকেরদের মানের অন্যথা হইবেক, এইহেতুক তিনি আপন এবং আপন অমাত্যগণের মানরক্ষার উপায় পূর্ব্বে চেষ্টা করিতেছেন।... চন্দ্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা

করি যে হিন্দু কালেজ স্থাপিত হওনের পূর্ব্বে কি হিন্দু বালকদিগের কখন কোন কদাচার হইত না? কেবল বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া কি তাঁহারা সহস্র অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন? কালেজ স্থাপিত হওনের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় কয়েক জন বাঁকা বাবুরা তাঁহারদিগের স্ব স্ব পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক ধনাধিকারী হইয়া ধনযৌবন এবং মূর্খতাপ্রযুক্ত মদ্যপান এবং যবনীগমনাদি কোন্ কোন্ অবৈধ কর্ম্ম না করিয়াছেন এবং পৈতৃক ধন কি কি রূপ অসদ্ব্যয়ে না নষ্ট করিয়াছেন? উক্ত বাঁকা বাবুদিগের নাম লিখিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু উক্ত বাঁকা বাবুরা উক্ত কালেজের নাম কখন কর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন কিনা আমরা বলিতে পারি না। ...শুনিয়াছি নববাবু বিলাস নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন মহাশয় কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা কি চন্দ্রিকাকার ভ্রমেও পাঠ করেন নাই? কেবল ক্রোধান্বিত হইয়া অল্পবয়স্ক কালেজের ছাত্রদিগের উপর প্রাণপণে আক্রমণ করিয়াছেন। উক্ত কালেজে যাঁহারা যাঁহারা বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহারা কি সকলেই মন্দ?... পূর্ব্বজন্মার্জিতা বিদ্যাঃ পূর্ব্বজন্মার্জিতং ধনং ইত্যাদি বচনসত্ত্বেও বহুকষ্টে বিদ্যোপার্জ্জন হয় এবং বিদ্যাধনকে মহাধন শাস্ত্রে বলিয়াছেন, যথা— বিদ্যারত্নং মহাধনং ইত্যাদি। অতএব যখন বিদ্যারূপ যে মহারত্ন তাহার মূলোৎপাটনের চেষ্টায় চন্দ্রিকাকার মহাশয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন তাহাকে দেশের ক্ষতিকারকভিন্ন আর কি বলিব।...''

'সমাচার দর্পণ' ছাড়াও সেসময় 'ইন্ডিয়া গেজেট', 'বেঙ্গল হরকরা' কিংবা 'রিফর্মার'-এর মত ইংরেজি পত্রিকাগুলিও ডিরোজীয়ানদের পক্ষ সমর্থন করে লিখত। যদিও তরুণদের অনাবশ্যক উগ্রতা ও অসহিষ্ণু মনোভাবের প্রতি তাদের সমর্থন ছিল না। বিশেষ করে রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের প্রতি তাঁদের বক্র দৃষ্টিভঙ্গীর তারা নিন্দাই করেছিল। এক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য ছিল, রামমোহনের সংস্কার আন্দোলনের প্রতি ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের এহেন উগ্র সমালোচনা আখেরে দেশে সংস্কার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যকেই বানচাল করে দেবে। অথচ উভয়েরই লক্ষ্য এক। লক্ষ্য অর্জনের পথ ভিন্ন মাত্র।

পরিশিষ্ট - ৫

রামমোহন ও ডিরোজিও

লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের অভিন্নতা সত্ত্বেও রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যরা কঠোর বিদ্রূপাত্মক সমালোচনার ভাষাই প্রয়োগ করেছিলেন; এবং এই ঘটনা প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সেসময় যুযুধান দুই প্রধান শিবিরের মধ্যে মূল দ্বন্দ্বে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছিল নিঃসন্দেহে। রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের তরুণ ডিরোজীয়ানরা ব্যঙ্গ করতেন 'হাফ লিবারেল' বলে। অপরদিকে, রামমোহনের অনুগামীদের কাছে তাঁরা ছিলেন 'আলট্রা র‍্যাডিকাল'। যদিও আশ্চর্যের বিষয় এই, রামমোহন নিজে কিন্তু কখনওই ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি। অন্ততঃ প্রকাশ্যে। সেরকম কোন ঐতিহাসিক নথি আমাদের কাছে নেই। অথচ 'ইস্ট ইন্ডিয়ান' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে ডিরোজিও সেদিন রামমোহন সম্পর্কে খোলাখুলিই মন্তব্য করেছিলেন—

> "Rammohan Roy... what his opinions are, neither his friends nor foes can determine. It is easier to say what they are not, than what they are,..."
> (East Indian; Source— Asiatic Journal, Asiatic Intelligence, vol. 7, P. 174)

অর্থাৎ, রামমোহনের মত ও আদর্শ ঠিক কী, এটা বলার চেয়ে সেগুলি ঠিক কী নয়, এটা বলা অধিকতর সহজ। অর্থাৎ রামমোহনের মত ও আদর্শকে ডিরোজিওর মনে হয়েছিল একটা 'সুবিধাবাদী' ঘোলাটে ব্যাপার। তিনি আরও লিখেছিলেন—

> Rammohan, it is well known, appeals to the *Veds,* the *Koran,* and the *Bible*, holding them all probably in equal estimation, extracting the good from each and rejecting from all whatever he

considers apocryphal. He has been known to attend and join in prayer both among Christian and Hindoo Unitarians; but whether he prefers the forms of the one or the other, it is difficult to determine. We have seen persons salute him as a Brahmin and we have heard him pronounce the Brahminical benediction upon such occasions; and if the proceedings of the Brumhu Subha as regulated at present, have been sanctioned by him, it is obvious that the Brahmins are treated by his followers with as much respect, as they are by the most orthodox. He has always lived like a Hindoo, drinking a little wine occasionally in the cold weather. He has, we believe, sat at table with Europeans, but never eaten anything with them." (প্রাগুক্ত)

বলাবাহুল্য, এই সমালোচনার ভাষায় সেদিন যৌবনসুলভ অসহিষ্ণু উগ্রতার ঝাঁঝটু ছিল বেশি। নাহলে রামমোহন ইউরোপীয়ান সাহেবদের সাথে একই টেবিলে বসতেন অথচ একসঙ্গে খানাপিনা করতেন না এমন কথা 'ইস্ট ইন্ডিয়ান'-এর তরুণ সম্পাদক ঝোঁকের মাথায় কখনও লিখতে পারতেন না। অন্ততঃ লেখার আগে একটু ভালোরকম খোঁজ-খবর নিয়ে লিখতেন। কারণ খাদ্যাখাদ্যের অর্থহীন বাছ-বিচারের বিরুদ্ধে এদেশে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন রামমোহনই। নিজে গোঁড়া বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করেও মাংস খাওয়াটাকে তিনি অন্যায় মনে করতেন না। মুসলমান বাবুর্চির হাতে রান্না করা পোলাও কোপ্তা খেতে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। কলকাতায় আসার আগে রংপুরে থাকার সময় রোগাক্রান্ত হলে ডাক্তারের পরামর্শে তিনি প্রথম মাংস খান। এই ঘটনা তাঁর মা তারিণীদেবীর কানে পৌঁছলে তিনি পুত্রের উপর যারপরনাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু রামমোহন গ্রাহ্য করেননি সেসব। স্পেনের দাসত্ব থেকে দক্ষিণ আমেরিকা মুক্ত হলে আনন্দে আত্মহারা রামমোহন কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেন। সেদিন এই

ভোজসভায় ইউরোপীয় সাহেবদের সাথে একত্রে খানাপিনা করেছিলেন এদেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুও। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে হিন্দুদের তদানীন্তন প্রচলিত সংস্কারের কোনরকম তোয়াক্কা যে রামমোহন করতেন না তার আরেকটি বড় প্রমাণ, মানবদরদী ডেভিড হেয়ার সাহেবের প্রায়ই রামমোহনের বাড়িতে ভোজে অংশগ্রহণ। আর পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডে থাকার সময় অনেক ইংরেজ পরিবারেই যে তিনি নিঃসঙ্কোচে খেতেন, সে তো অনেকেরই জানা কথা।

আর শুধু তো রামমোহন নিজেই নন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তিনি তাঁর এই সংস্কারমুক্ত মনের আদর্শ সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও। রামমোহনের প্রিয় অনুগামী দ্বারকানাথ ঠাকুরও প্রায়ই তাঁর বেলগাছিয়ার বাগান বাড়িতে ভোজের আয়োজন করতেন। এইসব ভোজসভায় দেশীয় গণ্যমান্যদের সাথে হাজির হতেন শহরের প্রভাবশালী ইংরেজরাও। খানাপিনা চলত একত্রে। ভোজসভায় নেমন্তন্ন করার ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ কোনরকম জাতিবিচার কিংবা নির্দিষ্ট ব্যক্তিটির অর্থকৌলিন্য বিচার করতেন না। এর কারণ, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোকদিগকে একত্র হইবার সুযোগ দিবার জন্য দ্বারকানাথ অতিশয় উৎসাহী ছিলেন"। (আত্মীয়সভার কথা। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গে াপাধ্যায়। পৃ. ১০১) বলাবাহুল্য, সেদিনকার পরিস্থিতিতে এর জন্য কম দুঃখ স্বীকার করতে হয়নি দ্বারকানাথকে। তাঁর নিজের পরিবারের মহিলারা, এমনকি তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত তাঁর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতেন। বাড়ির বাইরে একটা খোলা জায়গায় একখানা বৈঠকখানা ঘর তৈরি করে আলাদা থাকতে হত তাঁকে। একটু প্রায়শ্চিত্ত করলে সব ঝামেলা মিটে যেত। কিন্তু সেরকম দুর্বলচিত্ত, কাপুরুষ তিনি ছিলেন না। দ্বারকানাথ ছাড়াও সেসময় তেলিনীপাড়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, আত্মীয়সভার অপর একজন উৎসাহী সভ্য অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমাজের উপাসনার শেষে প্রায়ই এইরকমের ভোজ দিতেন। তবে হ্যাঁ, এইসব ভোজসভায় যোগদানকারী সমস্ত হিন্দুই যে ইউরোপীয়দের সাথে ইংরেজী পদ্ধতিতে খানা-পিনা করতেন তা নয়, অনেকেই শুধুমাত্র হাজিরা দিয়ে কিংবা অন্যান্য আমোদ-আহ্লাদে অংশগ্রহণ করে ফিরে আসতেন। কিন্তু যাঁরা খেতেন,

তাঁদের নিয়ে কুৎসার বন্যা বয়ে যেত সমাজে। এঁদেরকে বিদ্রূপ করেই সে সময় ছড়া বাঁধা হয়েছিল—

"বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি কাটার ঝনঝনানি,
খানা খাওয়ার কত মজা, আমরা তার কি জানি?
জানেন ঠাকুর কোম্পানী"।

'এদেশীয়রা রামমোহনকে ব্রাহ্মণ হিসাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করত, তাঁর চরণে দণ্ডবৎ হত এবং তিনিও তাদের ব্রাহ্মণের মতই আশীর্বাদ করতেন'—ডিরোজিওর এবম্বিধ উক্তিতেও সত্য ছিল না। কারণ এদেশে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে প্রধান যে দুটি শক্তির বিরুদ্ধে রামমোহনকে সেদিন লড়তে হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল বিদেশী খ্রিস্টান মিশনারী সম্প্রদায় এবং অন্যটি এদেশের গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজ, যার মধ্যে রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্র, এমনকি তাঁর মা তারিণীদেবীও ছিলেন। গ্রাম্য ঘোঁট পাকিয়ে রামমোহনকে সমাজ ও জাতিচ্যুত করার পেছনে তারিণীদেবীর ভূমিকা ছিল প্রধান। শুধু তাই নয়, কলকাতায় স্থায়ীভাবে চলে আসার বছর খানেকের মধ্যেই গোঁড়া ব্রাহ্মণরা তাঁকে দু'দুবার হত্যা করার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'মিশনারী রেজিস্টার' ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে লেখে— "The Bramins had twice attempted his life but he was fully in his guard". ব্রাহ্মণসুলভ ঠাঁট-বাঁট বজায় রেখে চললে দেশীয় ব্রাহ্মণদের এতদূর শত্রুতা স্বাভাবিক কারণেই তাঁর প্রাপ্য নয়। কিন্তু এই শত্রুতার মোকাবিলা করেই তাঁকে আজীবন চলতে হয়েছে। হিন্দু ধর্মের মত খ্রিস্ট ধর্মকেও যুক্তির কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছিলেন বলে তিনি একইভাবে দেশের প্রভাবশালী ইংরেজ ও খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে 'Precepts of Jesus' নামে ইংরেজীতে তিনি যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাতে তাঁর উপর মিশনারীদের অনেকেই খেপে ওঠেন এই কারণে যে রামমোহন তাঁর এই গ্রন্থে খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব ও অলৌকিকত্ব বাদ দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সাথে তাঁর প্রবল সংঘর্ষের সূত্রপাত। তিনি খ্রীস্টান মিশনারীদের লোক ঠকানো ত্রিত্ববাদকে

ঘৃণা করতেন। রামমোহনের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান মিশনারীদের শত্রুতা সম্পর্কে রামমোহনেরই অকৃত্রিম বন্ধু, 'ক্যালকাটা জার্নাল' পত্রিকার সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহাম যথার্থই লিখেছিলেন, "He was rewarded by the coldness and jealousy of all the great functionaries of the Church and the State in India". রামমোহন নিজেও তাঁর শেষ জীবনে লন্ডনে থাকাকালে একটি বক্তৃতায় দুঃখ করে বলেছিলেন, 'I laboured under many disadvantages. In the first instance, the Hindoos and the Brahmins, to whom I am related, are all hostile to the cause; and even many Christians there are more hostile... than the Hindoos and the Brahmins".

বস্তুতঃ, এদেশের সনাতন হিন্দু ধর্মের মূলে প্রথম কুঠারাঘাত রামমোহনই করেছিলেন। আর এই কাজটা তিনি করেছিলেন ধর্মকে সংস্কার করার মধ্য দিয়েই। ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যেই যতদূর সম্ভব উদার গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলির উন্মেষ তিনি ঘটাতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতেও মানবতাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত এভাবে ধর্মকে সংস্কার করার মধ্য দিয়েই হয়েছে। আমাদের দেশেও এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় নি। বস্তুতঃ রামমোহনই এদেশের প্রথম ব্যক্তি যাঁর মধ্য দিয়ে মানবতাবাদী ধ্যান-ধারণা জীবনের সর্বদিককে ব্যাপ্ত করে একটি সুসংহত জীবনাদর্শ হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পাশ্চাত্যের উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সেই সঙ্গে ফ্রান্সের চলমান বিপ্লব, ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ইত্যাদি গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে তাঁকে এবং এরই অদম্য প্রেরণায় তিনি এদেশের যুগান্তসঞ্চিত অন্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। শুরু করেন সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। এপ্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "হিন্দুদের প্রচলিত ধর্মীয় ব্যবস্থা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থপূরণে একেবারেই উপযুক্ত নয়। অর্থহীন জাতিভেদ প্রথা তাদের দেশাত্মবোধ থেকে বঞ্চিত করেছে। ফলে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্যই তাদের ধর্মব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন জরুরী"। (১৮ জানুয়ারি ১৮২৮। জন ডিগবিকে লেখা চিঠি।) তিনি আরও লেখেন, "যদিও আমি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছি, এবং আমার শৈশব ও কৈশোরের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাই এই সম্প্রদায়ের নিয়মে, তবুও আমি নিঃশংসয়ে উপলব্ধি করেছি আমার স্বদেশবাসীর অসংখ্য

দুর্ভাগ্যজনক বিকৃতি, এবং এই উপলব্ধির ভিত্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি এই কারণে যে, আমি চেয়েছি, যাতে তাদের ধ্যান-ধারণাসমূহ উন্নত হয়ে ওঠে এবং তারা আলোকিত হতে পারে একটি অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ নৈতিক জীবনবোধের আলোকে'। (১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে, প্রকাশিত 'ঈশোপনিষদে'র ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকা।) মূলতঃ এই উদ্দেশ্যেই কলকাতায় আসার পর ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি আত্মীয়সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই আত্মীয়সভার অধিবেশনেই তিনি ও তাঁর অনুগামীরা প্রথম হিন্দুদের অর্থহীন জাতিভেদপ্রথা, পৌত্তলিকতা, সতীদাহ ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ডিরোজিওর বয়স তখন মাত্র ছয়। সবেমাত্র শিক্ষালাভের জন্য প্রেরিত হয়েছেন ডেভিড ড্রামন্ডের স্কুলে।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনে রামমোহন বেদান্তকে হাতিয়ার করেছিলেন। যৌবনেই শিক্ষালাভের সময় ইসলামের একেশ্বরবাদ ও সেই সঙ্গে বেদান্তকথিত পরম ব্রহ্মের ধারণা হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলেছিল তাঁকে। পরে চাকরিসূত্রে রংপুরে অবস্থানকালে এর সাথে যুক্ত হয় নবযুগের নবচেতনা সমৃদ্ধ পাশ্চাত্যের উন্নত মানবতাবাদী ধারণা। বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর মানবতাবাদী ধ্যান-ধারণায় সম্পৃক্ত তাঁর এই একেশ্বরবাদী আদর্শ স্পষ্টতঃই এদেশের বুকে নবযুগের সূত্রপাত করে। সমাজ সংস্কারের সুকঠিন সংকল্প নিয়ে তিনি চলে আসেন কলকাতায়, এবং এর দু'তিন বছরের মধ্যেই তিনি বাংলায় বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল যে শাস্ত্রকে হিন্দুরা মানে অথচ যে শাস্ত্র সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ তারই সাহায্য নিয়ে তাদের কল্পিত হাজারো দেব-দেবীর অস্তিত্বকে নস্যাৎ করা। এ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার, শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে কিন্তু রামমোহন কখনওই গ্রহণ করেননি। ফলে রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ'-এর বিরুদ্ধে সেসময় গোঁড়া ব্রাহ্মণদের প্রধান অভিযোগই ছিল, এসব করে রামমোহন আসলে বেদের প্রকৃত অর্থ গোপন করছেন এবং এরা কেউই রামমোহনকে বেদান্তবাদী বলেই মনে করতেন না। তাদের কাছে রামমোহন ছিলেন একটি কালাপাহাড়। পরবর্তীকালে সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও আমরা দেখি রামমোহন নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে হিন্দুদেরই প্রাচীন শাস্ত্রের আশ্রয় নিচ্ছেন। এর অর্থ একটাই। তিনি এদেশের সমাজটাকে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন ভেতর থেকে, যাতে নবযুগের উন্নত মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলি সমাজের অধিকাংশ মানুষের কাছে বোধগম্য এবং

গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজন ছিল সমাজ প্রগতির পরিপূরক একটি সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচীকে সামনে রেখে বিভিন্ন সামাজিক শক্তির প্রগতির অনুকূলে সমাবেশ; এবং এই অত্যন্ত জরুরী ও সুকঠিন কাজটি তিনি করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভার সদস্য হিসাবে পরিগণিত হতে গেলে একটি অবশ্য পালনীয় সাধারণ নিয়মই ছিল হিন্দুদের পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাস। তবু এরপরেও এক্ষেত্রে তাঁর অনুগামীদের অপৌত্তলিক এই আদর্শ পালন করতে গিয়ে অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা তিনি জানতেন। এবং সেই সাথে তিনি এটাও জানতেন, যে দেশের জন্য সংস্কার আন্দোলন সেই দেশের মানুষগুলিকে, বিশেষতঃ যাঁরা সমাজ প্রগতির একটা ন্যূনতম বোধ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতির চাপে বহু সময়ই আপোষ করতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের উপেক্ষা করে, বাতিলের খাতায় নাম তুলে দিয়ে এবং তারই পরিণতিতে এক সময় তাঁদের শত্রু শিবিরের দিকে ঠেলে দিয়ে, কোনও আন্দোলনই তার কাঙ্ক্ষিত সফলতায় পৌঁছতে পারে না। তাই দেশের অজ্ঞ, অশিক্ষিত, কুসংস্কারগ্রস্ত জনসাধারণের চেয়ে নিজেকে অধরা কোন দূরত্বে এগিয়ে রাখাকেও যেমন তিনি কোন কার্যকরী বাহাদুরি বলে মনে করতেন না, তেমনি সমাজের প্রচলিত নিয়ম-কানুনের সাথে নির্মম সংঘাতের রাস্তাটা এড়িয়ে যাওয়া যাবে— এমন কাপুরুষোচিত বিবেচনায় জনসাধারণের আত্মঘাতী বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার লেজুড়বৃত্তি করাটাকেও তিনি মনে করতেন দোষাবহ।

কিন্তু সামাজিক সংস্কার আন্দোলন পরিচালনায় রামমোহনের এই আদর্শের যথার্থ মূল্যায়ন ডিরোজিও করতে পেরেছিলেন কি? বোধ হয় না। না হলে 'ব্রাহ্মণ' অভিধায় তিনি রামমোহনকে কখনওই ভূষিত করতে পারতেন না। আসলে ধর্মসংস্কারের প্রশ্নে রামমোহনের আস্তিক্যবাদী অবস্থানকে তিনি কখনওই মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি সক্রোধে আক্রমণ করেছিলেন রামমোহনকে। কিন্তু রামমোহনের এই 'আস্তিক্যবাদ' যে নবযুগের নবচেতনার জারক রসে সিঞ্চিত হয়ে দেশের সমস্ত ধর্মীয় অন্ধতার মূলেই যুক্তির খরধার কৃপাণ চালিয়ে দিয়েছে, সেটা বিচার করবার মত স্থৈর্য, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা, আর কিছু না হোক, হয়ত বয়সোচিত কারণেই ডিরোজিওর সেসময় ছিল না, একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। তবে রামমোহনের অনুগামীদের মধ্যে একটা বড় অংশের আপোষমুখী, এমনকি দ্বি-চারী, কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্যে যে সত্যতাও

ছিল সে-কথা অস্বীকার করারও কোন উপায় নেই। কারণ, 'ইস্ট ইন্ডিয়ানে'র পাতায় তিনি সেদিন যথার্থই লিখেছিলেন—

> "His (Rammohan's) followers, at least some of them, are not very consistent. Sheltering themselves under the shadow of his name, they indulge to licentiousness in everything forbidden in the Shastras as meat and drink; while at the same time they fee the Brahmins, profess to disbelieve Hindooism, and never neglect to have poojahs at home". (East Indian; Source— Asiatic Journal, Asiatic Intelligence, vol. 7, P. 174)

কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগলেও এর অধিকাংশই ছিল সত্য। অপৌত্তলিক আদর্শের ঢ্যাড়া পিটিয়ে রামমোহনের অনুগামী, 'রিফর্মার' পত্রিকার সম্পাদক বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতি বছর ধূমধাম সহকারে দুর্গাপূজার আয়োজন সে সময় সংস্কারপন্থীদের মধ্যেই তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছিল। বলাবাহুল্য, আদর্শের প্রশ্নে এই আপোষ ডিরোজিওর পক্ষে সহ্য করা ছিল অসম্ভব। তাই তিনি এঁদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সংশয় প্রকাশ করেছিলেন এঁদের প্রচারিত আদর্শে। শুধু ভুল হয়েছিল— নবজাগরণের সেই শুরুর দিনগুলিতে তদানীন্তন সমাজ পরিস্থিতির বিচারে যতটুকু সাহসিকতার কাজ তাঁরা করেছিলেন, যৌবন সুলভ অসহিষ্ণুতা ও আবেগের আতিশয্যে সেটুকুরও মূল্য তিনি দেননি। আর তার চেয়েও বড় ভুল রামমোহনের অনুগামীদের সাথে রামমোহনকে হরে-দরে এক করে ফেলা। যদিও পরবর্তীকালে দেখা গেছে, তাঁরই শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই রামমোহন সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে গেছেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল কলকাতার টাউন হলে তাঁর স্মৃতিতে যে সভা হয় তাতে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডিরোজিওর অন্যতম অনুগামী রসিককৃষ্ণ মল্লিক। কিন্তু সে যাই হোক, ব্যক্তিগত জীবনাচরণে আদর্শ পালনের প্রশ্নে সকলেই যে রামমোহন ছিলেন না, এটুকু অন্ততঃ ডিরোজিওর বোঝা উচিত ছিল। আর এটা বুঝলে তিনি হয়ত আরও খানিকটা

যত্নের সাথে রামমোহনের সামাজিক আন্দোলনের আদর্শকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে পারতেন। কিন্তু তা হল না। তাই রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের সাথে তুলনা করে তিনি তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ বাংলার নবজাগ্রত 'Young Lions'দের সম্পর্কে লিখলেন, একমাত্র কাজের কাজ তো এঁরাই করতে পারে, কারণ Compromise বলে কোন শব্দ এঁদের অভিধানে নেই। এঁরা সংখ্যায় কম, কিন্তু "the best and most talented". লিখলেন—

> "It is composed of several young gentlemen educated at the Hindoo College, bent upon removing from their countrymen the weight of superstition and ignorance under which they have long groaned, and honest enough to avow their sentiments wherever occasion requires... They do not mince matters by making a compromise between right and wrong. Show them the error of their ways, and they, being open to conviction, will renounce what is erroneous and cling to what is true. They are principally to be admired for their fearless honesty. Knowing the risks they run, knowing the persecution to which they will be subject, and knowing the feeling against them, they never scruple to maintain their opinions in the face of friends and foes. They do not hesitate to act as they think, and to acknowledge what they do".
>
> (প্রাগুক্ত)

বলাবাহুল্য, তারুণ্যের এই তিমিরবিনাশী স্পর্ধা, সমস্তরকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে চোখ ঝলসানো এই তেজ নেহাতই ফাঁকা আওয়াজ ছিল না। ডিরোজিও ও তাঁর তরুণ শিষ্যরা এর প্রমাণ সেদিন দিয়েছিলেন। তাই হয়ত এঁদের সমর্থনে রামমোহন কিছু বলেন নি ঠিকই, কিন্তু বিরুদ্ধেও একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। বাংলার Young Lions— দের সামাজিক বিদ্রোহের আতিশয্যের দিকটা

তিনি জানতেন। এও জানতেন জীবনের সর্বদিককে ব্যাপ্ত করে সমাজ সংস্কারের যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেছেন তাকে এ ধরনের উগ্রতা ক্ষতিগ্রস্তই করবে, কারণ ঝড় যত শক্তিশালীই হোক বাইরে থেকে আছড়ে পড়ে তা কখনও কোনো দেশের সমাজকে বদলে দিতে পারে না— যেমন শিক্ষার অভাবে, জ্ঞানের অভাবে যে মানুষ সত্যের আলো পায় নি, লক্ষ কোটি অন্ধ সংস্কার যাকে অমানুষ করে তুলেছে, আঘাত করে তাকে কখনও বড় করে তোলা যায় না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। তাঁর অনুগামীরা অনেকেই ডিরোজিও-র বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন। কিন্তু তিনি নীরব হয়েই থেকেছেন। হয়ত ডিরোজিও ও তাঁর তরুণ ছাত্রদলের মহৎ আদর্শের সৌন্দর্যের দিকটা তাঁর বিরাট সংস্কারমুক্ত মনে গভীর বেদনার সাথে ধরা পড়েছে শুধু।

পরিশিষ্ট - ৬

অগ্রগণ্য ডিরোজীয়ানদের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩ - ১১.৫.১৮৮৫) : কলকাতার ঝামাপুকুরস্থিত বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মাতুলালয়ে জন্ম। পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মা শ্রীমতি দেবী। চার ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয়। শৈশবে শিক্ষালাভ হেয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলে। হিন্দু কলেজে প্রবেশ ১৮২৪ সালে। ১৮২৯ সালের ১ নভেম্বর হিন্দু কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হন এবং ঐ বছরই হেয়ার তাঁকে নিজ প্রতিষ্ঠিত স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৩১ সালের ১৭ মে নিজস্ব সম্পাদনায় প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক 'Inquirer' পত্রিকা। ১৮২৯ সালে ১৬ বছর বয়সে হাবড়া নিবাসী রাধারমণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা বিন্দুবাসিনীকে বিয়ে করেন। ১৮৩২ সালের ১৬ অক্টোবর খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। খ্রিস্টীয় আচার্যের পদে উন্নীত হন ১৮৩৭ সালে। বাংলা ভাষায় প্রথম কোষগ্রন্থের রচয়িতা। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার আদর্শে রচিত 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নামে এই কোষগ্রন্থটি ১৩ কান্ডে ১৮৪৬-৫১ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। হিন্দুদের ষড়দর্শন সম্পর্কে গবেষণাধর্মী গ্রন্থ 'ষড়দর্শন সংবাদ' এবং 'The Aryan Witness'-এরও রচয়িতা। ১৮৫১ সালে বেথুন সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। বিশপ কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন ১৮৫২ সালে। ১৮৭৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর অফ ল' উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৮ সালে ভারতসভার সভাপতি মনোনীত হন। ১৮৮০ সালে কলকাতার অধিবাসীরা তাঁকে মিউনিসিপ্যালিটিতে পাঠায়।

রামগোপাল ঘোষ (১৮১৪/১৫-২৫.১.১৮৬৮) : অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তির জন্য দেশে-বিদেশে 'ইন্ডিয়ান ডিমোস্থেনিস' নামে বিখ্যাত। জন্ম কলকাতার বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। পিতা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। হিন্দু কলেজের পাঠ সমাপনান্তে স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। প্রথমে 'Kelsall, Ghosh & Co.'-তে যৌথ অংশীদারিত্বে এবং পরে সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় 'R. G. Ghosh & Co.' স্থাপন করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। অতুলনীয় বন্ধু বাৎসল্য, সততা এবং জীবনব্যাপী জ্ঞানানুশীলনের জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনেও ছিলেন অগ্রণী। ১৮৪৯-৫০ সালে 'কালা আইন' বা 'Black Acts' সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা সমগ্র দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইংরেজরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির সহ-সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেয়। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানেও। এমনকি বিধবার বিবাহের যৌক্তিকতা সম্পর্কে স্ব-সম্পাদিত দ্বিভাষিক পত্রিকা 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এ লেখালেখি শুরু করেছিলেন বিদ্যাসাগরের আন্দোলনেরও আগে থেকে। প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাঙ্গনে অবস্থিত হেয়ার-এর মূর্তি স্থাপনে তাঁর উদ্যোগ ছিল প্রধান। এর জন্য খরচ হওয়া মোট ১৬-১৭ হাজার টাকার সবটাই তিনি এবং ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্য সদস্যরা দিয়েছিলেন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৮.১.১৮৫৮) : জন্ম কলকাতার সিন্দুরিয়াপটী নামক স্থানে। পিতার নাম নবকিশোর মল্লিক। কৈশোরে একবার সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষ্যদানকালে তামা-তুলসী ও গঙ্গাজল ছুঁয়ে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন 'I do not believe in the sacredness of the Ganges'. রামমোহনকে শ্রদ্ধা করতেন। ১৮৩৪ সালে রামমোহনের স্মরণসভায় তিনিই ছিলেন একমাত্র বাঙালি বক্তা। দক্ষিণারঞ্জনের পরে দ্বিভাষিক পত্রিকা 'জ্ঞানান্বেষণ' পরিচালনার দায়িত্বে আসেন। বর্ধমানের ডেপুটি কালেক্টর পদে ছিলেন বহুদিন।

সেসময় কর্মক্ষেত্রে সততার অনন্য নজীর সৃষ্টি করেন। দেশে অবৈতনিক ইংরেজি ও বাংলা স্কুল স্থাপনেও ছিলেন উদ্যোগী।

প্যারীচাঁদ মিত্র (২২.৭.১৮১৪-২৩.১১.১৮৮৩) : টেকচাঁদ ঠাকুর নামেও প্রসিদ্ধ। বাংলার চার্লস ডিকেন্স। জন্ম কলকাতায়। পিতা রামনারায়ণ মিত্র। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর (পরবর্তীতে জাতীয় গ্রন্থাগার) সেক্রেটারি, লাইব্রেরীয়ান ও কিউরেটর ছিলেন। ১২ মার্চ ১৮৩৮ হিন্দু কলেজ হলে ৩০০ যুবকের উপস্থিতিতে যে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি ও রামতনু লাহিড়ী ছিলেন তার যুগ্ম-সম্পাদক। রাধানাথ শিকদারের সাথে যৌথ সম্পাদনায় ১৮৫৪ সালে মহিলাদের জন্য 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাতেই তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের সহজ লোকপ্রচলিত ভাষারীতি (আলালী ভাষা) বাংলা গদ্যকে দুর্বোধ্য সংস্কৃতের হাত থেকে মুক্তি দেয়। রচিত অন্যান্য গ্রন্থ— 'A Biographical Sketch of David Hare', 'বামাতোষিণী', 'কৃষিপাঠ', 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' ইত্যাদি। আজীবন বহু সভা-সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন।

রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৭.৫.১৮৭০) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর শিকদার পাড়ায়। পিতার নাম তিতুরাম শিকদার। প্রথম ভারতীয় যিনি হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থটি পাঠ করেন। আমৃত্যু যুক্তিবাদী, বস্তুবাদী এবং বিজ্ঞানমনস্ক। ১৮৩২ সালে প্রথম ভারতীয় হিসাবে কর্নেল জর্জ এভারেস্টের অধীনে ত্রিকোণমিতিভিত্তিক জরিপ বিভাগে কম্পিউটারের চাকরি পান। ভূমির উচ্চতা জরিপের কাজে জর্জ এভারেস্ট কর্তৃক আবিষ্কৃত 'এক্স-রে পদ্ধতি'র প্রথম প্রযোক্তা। ১৮৫২ সালে হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরের (মাউন্ট এভারেস্ট) উচ্চতা (২৯০০২ ফুট) মাপেন। শিল্প প্রশিক্ষণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ১৮৫৪ সালে কলকাতা আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট সোসাইটি স্থাপনে মূল ভূমিকা পালন করেন। সংস্কৃত, ইংরেজি, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ছিলেন ব্যাভেরিয়ার প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক সোসাইটির লেখক ও সদস্য। সহজ লোকপ্রচলিত, বিশেষ করে মহিলাদের উপযোগী বাংলা গদ্য নির্মাণে ছিলেন উৎসাহী। প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগিতায় মহিলাদের জন্য 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করেন। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরোধী ছিলেন। চাকরীসূত্রে দেরাদুনে অবস্থানকালে কুলিদের বেগার প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।

রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৩.৮.১৮৯৮) : জন্ম নদীয়ার বারুইহুদা গ্রামে মাতুলালয়ে। পিতা রামকৃষ্ণ এবং মা জগদ্ধাত্রী দেবী। হিন্দু কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে ঐ কলেজেই শিক্ষকের কাজ পান। পরে ১৮৪৬ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ খোলা হলে সেখানে যোগ দেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী, সমাজ সংস্কারক এবং সৎ, নির্লোভ ও উদার চরিত্রের অধিকারী। স্ত্রী-স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্মীয় অনুশাসন মানতেন না। ব্রাহ্মদের মত সমর্থন করলেও নিজে কখনও ব্রাহ্ম হননি। সামাজিক নির্যাতন উপেক্ষা করে চিরকালের জন্য উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র 'সুরধনী' কাব্যে তাঁর সম্পর্কেই লিখেছিলেন— 'এক দিন তাঁর কাছে করিলে যাপন। / দশ দিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন।' তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর সুবিখ্যাত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থটি রচনা করেন।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজা (১৮১৪-১৮৭৮) : জন্ম কলকাতায়। পিতা জগমোহন। কলকাতার প্রথম ভারতীয় কালেক্টর। বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের বিধবা রানী বসন্তকুমারীকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেন। বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেছিলেন বেথুন সাহেবকে। পরবর্তী জীবনে লক্ষ্ণৌবাসী হন। ১৮৭১ সালে লর্ড মেয়ো তাঁকে 'রাজা' উপাধি দান করেন।